রাত ভোর

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স ॥ কলিকাতা বারো ॥

প্রথম সংস্করণ : আশ্বিন, ১৩৬০

দ্বিতীয় সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩

প্রকাশক : শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলিকাতা— ১২

মুদ্রাকর : শ্রীঅরবিন্দ সরদার

শ্রী প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৮।৩, চিন্তামণি দাস লেন

কলিকাতা — ৯

প্রচ্ছদপট-শিল্পী :

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ :

ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই : বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

দু টাকা

শেষ রাতের স্তিমিত তারাগুলো তখনও নিঃশেষ হয়ে যায়নি আকাশে। অন্ধকার পাতলা হয়ে এসেছে শুধু। বড় পগাড়ের পাশে বেতঝোপের সামনে ছোট লণ্ঠনের আলো জ্বালিয়ে বসে আছে তখনও লোটন। হাতে ছিপ আর পাশে বড় একটা চিথল আর ছটা মিরগেলের বাচ্চা। ভররাতের পারিশ্রমিকের নগণ্যতায় তৃপ্ত হয়নি লোটন। ছিপের ফাতনার দিকে তার জ্বলন্ত মনোযোগ।

হুটো খাটাস বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে শুকনো পাতার ওপরে শব্দ করতে করতে। গাবগাছের ওপর প্যাঁচার ভয়াল আওয়াজ হচ্ছিল মাঝে মাঝেই। ভ্রূক্ষেপ নেই লোটনের। ঘোষালবাড়ির পিছনে তল্লাবাঁশের ডগাগুলো হুয়ে পড়েছে পগাড়ের জলের ওপর। ও জায়গাটা ভারী অন্ধকার। ওই দিকটায় মাঝে মাঝে তাকায় লোটন। ভূতের ভয়ও নাকি আছে ওধারটায়। ভয় ওর করে না, তবু কৌতূহলটা ষোল আনা। ভূত জিনিসটাকে যদি একবার বরাতক্রমে চোখে দেখতে পায় ও, তবে কথাবার্তা আলাপ-সালাপ করে দেখতে পারে তাকে দিয়ে ওদের অবস্থাটা ফেরানো যায় কিনা! অনেক টাকা-পয়সা অনেক খাবার-দাবার যদি রোজ দিয়ে যায় ভূতটা, তাহলে না হয় তাকে আদর করে অভ্যর্থনা করে দেখা যায়। কিন্তু বরাতে কি অমন ভূত জুটবে?

লোটন তো কতদিন যুগীর ঘুপটি থেকে গাব কোচঁড়ে করে ফিরেছে গভীর রাত্রে বটতলার নীচ দিয়ে। লোকে তো বলে যুগীর ঘুপটির বটগাছতলায় রাত্রির বেলা গেলে শ্রেফ আঁকসির মতো কি একটা গলায় আটকে ডালের ওপর ভূতে তুলে নেয়। কিন্তু কই! লোটন তো একরাত্রিও তেমন কিছু হতে দেখে না। অন্ধকারে বটের মোটা মোটা শিকড়ের ওপর দাঁড়িয়ে কত রাত অপেক্ষাও করেছে, কিন্তু একটু সাড়াশব্দও পেল না কারও। শুধু বাদুড়ের ডানার ঝাপটার শব্দ মাঝে মাঝে আর ঝিঁঝিঁর একটানা ডাক। বড় জোর বর্ষার সময় ক্ষেতের আলের ধারে ধারে ব্যাঙের গোঙানি। আর না হয়ত ধানক্ষেতের ভেতর দেখা

গেছে দপদপ জ্বলছে আর নিভছে আগুনের ডেলা। ওগুলো নাকি আলেয়া। আলেয়া দেখবার চেষ্টা করছে লোটন। ক্ষেতের ভেতর দিয়ে এগিয়েছে আগুনের ডেলা লক্ষ্য করে। কিন্তু ও যত এগোয় ডেলাটা তত পিছিয়ে যায়। এক নম্বরের ভীতু এই আলোর জাতটা। বিরক্ত হয়ে ওঠে লোটন। আবার ক্ষেত থেকে সড়কে উঠে আসে।

এমন তো কতই হল কিন্তু ভূত দেখা গেল না। আজ গভীর রাতে মাছ ধরতে ধরতে লোটনের বোধ হয় বরাত ফিরল। স্পষ্ট ও দেখতে পেল ঘোষাল বাড়ির বাঁশঝোপের তলায় একটা শাদা মূর্তি নড়ছে। লণ্ঠনের আলোটা বাড়িয়ে ও এগিয়ে ধরল, ঠিকই দেখেছে। মূর্তিটি ঘোষালবাড়ির দিক থেকে এসে ঝোপের তলায় নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। এমন সুযোগ ছাড়া যায় না। লণ্ঠনের আলোয় যদি ভয় পেয়ে ভূত পালায়? ও চোখের আলো ভরসা করেই চলল। অন্ধকারে বেশ ভাল দেখতে পায় ও। অন্ধকারে বেড়িয়ে বেড়িয়ে অভ্যেস হয়ে গেছে।

কিছুটা এগিয়ে বাঁশঝোপের প্রায় কাছাকাছি গিয়ে পড়ে লোটন। অন্ধকারে দাঁড়ায় চুপ করে। কোথাও কিছু দেখা যায় না। শুধু একটানা ঝিঁঝির ডাক। ঘোষালবাড়ির বেড়ার ধারের দিকের একটা শব্দে সচকিত হয়ে ওঠে লোকটা। আর একটু ভেতরে ঢোকে। খসখস শব্দে পিছন ফিরে চমকে তাকায়। শুকনো বাঁশপাতার ওপর দিয়ে বোধ হয় চলে গেল একটা কাঠবেড়ালী।

লোটন থমকে দাঁড়ায়। আবার সেই শব্দ। শব্দটা বেশ জোরে। ঘোষালবাড়ির পিছন থেকেই আসছে। খানিকটা এগিয়ে যায় লোটন। ঘোষালবাড়ির পিছনে বেড়ার ধারে পরিষ্কার দেখা যায় একটা মানুষের মূর্তি। লোটনের বুকটা ধুকধুক করে ওঠে, ঠিক ভয়ে নয় এক অদম্য কৌতূহলে।

পা টিপে-টিপে এগোয়। মানুষটা বেশ স্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছে এখনও। মাটিতে পা আছে তো? ভূতের নাকি পা মাটিতে থাকে না। পায়ের দিকটা অন্ধকার। ভাল করে নজরে আসে না।

এবার এগিয়েই ঝাপটে ধরবে লোটন। যা থাকে বরাতে। কিন্তু বরাতে কিছুই থাকে না। লাফিয়ে পড়ে লোটন মূর্তিটার ওপরে। মানুষটা কথা কয়, ভাল গলায়,—ওরে বাপ রে রে?

লোকটাকে ততক্ষণে মাটিতে ফেলেছে লোটন,—বলে খুব সাহস করে,—কে তুই?

লোকটা রীতিমত ঘাবড়ে গিয়ে বলে,—আমি নটবর মুৎসুদ্দি।

নটবর মুৎসুদ্দি লোটনদের থার্ড পণ্ডিত।

লোটন তাকে ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে,—আপনি পণ্ডিত মশাই এত রেতে?

তুই কে?

আমি লোটন।

লোটন! ওই হালুইকরের ছেলে? মুৎসুদ্দির মেজাজ বাড়ে,—তুই এখানে কেন?

আপনি এখানে কেন? বলে লোটনও।

আমি তোকে কৈফিয়ত দেব, উল্লুক!

লোটন দেখতে পায় ঘোষালদের বিধবা দিদিটি এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের দাওয়ায়।

সঙ্গে সঙ্গে নরম হয়ে যায় মুৎসুদ্দি—যা যা, বলবিনি কাউকে একথা। শুনলে তোবে মেরে শেষ করে দেব। কাকপক্ষী যেন টের না পায়।

লোটন ফিরে চলে।

আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়।

উঁকি মেরে দেখে বিধবা দিদি এল মুৎসুদ্দির কাছে।

লোটন পেছন ফিরে এল ওর মাছ ধরবার জায়গায়।

আজও ভূত পাওয়া গেল না।

সেখানে এসে দেখে ওর মাছের চুপড়িটায় মাছ নেই। ছিপটা পড়ে আছে শুধু।

মাথাটা ঘুরে গেল লোটনের। বড় একটা চিথল, মিরগেলের বাচ্চা সাফ! কোথায় গেল? আশ্চর্য তো!

এমন তো কখনও হয় না!

কিছুক্ষণ বসে ভাবতে থাকে লোটন। কাল ভোরে তার বরাতে প্রহার।

কাকা তাকে মাছ ধরতে বারণ করে না। তার একমাত্র কারণ দুপুরের মাছটা লোটন ধরে আনলে মাছটা আর কিনতে হয় না।

লোটনও কাকার সম্মতি পেয়ে বিধবা মায়ের প্রচণ্ড আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে মাছ ধরতে চলে আসে। কিন্তু মাছ না পেলে তো কাকার মেজাজের থই পাওয়া যাবে না।

নানা ছুতোয় ধরে মারবে।

অথচ খুড়তুতো ভাই টুলুকে কোনদিন লোটনের সঙ্গে মাছ ধরতে দেবে না। টুলুর নাকি অসুখ করবে! টুলুর নাকি সর্দির ধাত! আর লোটনের অসুখ করতে জানে না!

কাকাকে বাগে পেলে হয় একবার।

খুব রেগে যায় লোটন পরদিন সকালের প্রহারের নিশ্চিত শঙ্কায়।

আবার ছিপ ফেলে।

কিন্তু ফাতনা আর ডোবে না।

বৃথা পরিশ্রম করে করে অবশেষে খালি হাতে ফিরতে হয় লোটনকে বাড়িতে।

ফিরতে একটু বেলাই হয়।

গিয়ে দেখে মা জল তুলছে রান্নাঘরে। ওকে দেখে একবার ধমকের দৃষ্টিতে। অর্থাৎ এত বেলা করে আসবার কি মানে? কথাটা চোখের ভাষাতেই বুঝতে পারে লোটন। জোরে বলবার সাহস মায়ের নেই। কাকা বাড়ি থাকতে মা যেন বোবা।

লোটন উত্তর না দিয়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে কিছুক্ষণের জন্যে।

টুলু আর লোটন বাইরের ঘরেই থাকে। টুলু ততক্ষণে কোঁচড়ে করে মুড়ি আর গুড় চিবোতে চিবোতে পড়তে শুরু করেছে।

লোটন শুয়ে শুয়েই বলে,—মনে মনে পড়। চেঁচাবিনি। একটু ঘুমোব।

লোটনের কথার অবাধ্য হবার সম্পূর্ণ সাহস না থাকলেও টুলু বলে একবার,—বারে, পড়তে মানা করছ, বাবাকে বলে দোব।

বলে দেখ না।—ধমকায় লোটন।

টুলু কথা পালটায়।

জানিস ভট্‌চাযদের বাগানে কাঁদিটা পেকেছে।

মানে কলার কাঁদিটা পেকেছে, টুলুর নিজের তো ক্ষমতা নেই বিশেষ। লোটন যদি ওটা সরিয়ে নিয়ে আসতে পারে, তবে মজা করে খাওয়া যায়।

লোটন উঠে বসে,—তাই নাকি?

হ্যাঁরে, আবার নজর পড়েছে ওই দফাদারদের ছেলেটার।

কে? ভোম্বল?

হ্যাঁ।

লোটন বিরস মুখে বসে থাকে চুপ করে।

যাবিনে। ওটা আজ রাতে পারবিনে সরাতে?

না।—নির্বিকার উত্তর দেয় লোটন।

টুলুর রাগ হয়ে যায়। আবার জোরে পড়তে শুরু করে।

চুপ মার।

ইতিমধ্যে এসে পড়ে টুলুর বাবা।

লোটন তখন টুলুর বই কেড়ে নেবার চেষ্টা করছিলো সবে। কাকাকে দেখে মুখ নীচু করে টুলুর বইটাই পড়তে থাকে।

টুলু বাবাকে দেখে ভরসা পায়।—এতক্ষণ আমায় পড়তে দিচ্ছিল না বাবা।

কাকা সুগঠিত পেশীবহুল হাতখানা বাড়িয়ে লোটনের একটি কান আকর্ষণ করে।

লোটন গুম হয়ে বসে থাকে।

টুলুর চোখদুটো জলজ্বল করে ওঠে আনন্দে। এইবার লোটনের মার।

কানটা মুলে বেশ সজোরে দুটো কান-সাপটা চড় বসায় কাকা।—ভররাত

আড্ডা মেরে এসে এখন টুলুর পড়ার ক্ষেতি করা হচ্ছে! উল্লুক কোথাকা! দূর করে দোব বাড়ি থেকে!

মাছ ধরতে গিয়েছিলুম যে—লোটন বলতে চায়।

কই, মাছ কই?

খাটাস বোধ হয় খেয়ে গিয়েছে তা আমি কি করব!

খাটাস খেয়ে গিয়েছে! মিছে কথা বলবার আর জায়গা পাসনি!

সত্যি কথাই বলছি।

ফের মুখে মুখে জবাব।—কাকা তেড়ে আসে।

লোটন গুম হয়ে বসে থাকে।

সকলের অলক্ষ্যে লোটনের মা ছুটে এসে বাইরে ঘরের দরজার পাশে কখন দাঁড়িয়েছে কেউ টের পায় না।

সুধন্য হালুইকর তার দোকানে যাবার বেলা হয়ে যাচ্ছে দেখে ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে ধাক্কা খায় লোটনের মায়ের সঙ্গে।

তুমি এখানে কি করছ বৌঠান?

দরজার পাশে লোটনের মা অপ্রস্তুতে পড়ে বলে,—এসেছিনু তুটো--ইয়ে—থানকুনি পাতা তুলতি বেড়ার পাশ থেকে।—

থানকুনি কি হবে?—বুঝেও একবার শুধোয় সুধন্য।

এই পেটটা একটু আঁব-আঁব মতো হয়েছিল—কথাটা ঢাকতে গিয়েও পেরে ওঠে না লোটনের মা। দেওরের ভয়ে যেন আড়ষ্ট হয়ে থাকে সব সময়।

সুধন্যর মুখখানা রাঙা হয়ে ওঠে,—এসো ভেতরে।

ভয়ে ভয়ে ভেতরে গেল লোটনের মা—কামিনীবালা।

ঘরে ঢুকে সুধন্য চড় মারতে থাকে লোটনকে।

ও মাগো—মাগো—বলে চীৎকার করে ওঠে লোটন।

কামিনী ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে চায়—দেখতে পারে না চোখ চেয়ে।

ছুটতে ছুটতে আসে সুধন্যর স্ত্রী গোলাপবালা।

ওমা ছেলেটাকে যে একেবারে মেরে ফেললে গো!—ছ্যাঃ ছ্যাঃ তুমি কি মনিষ্যি!

• লোটনকে ছিনিয়ে নেয় সুধন্যর হাত থেকে—ফের যদি তুমি ওর গায়ে হাত দেবা, বাড়ি থেকে জন্মের মতো চলে যাব আমি।

সুধন্যর গর্জন কমে আসে। গোলাপবালার রূপেই হোক কি তার বাপের রুপোতেই হোক সুধন্য গোলাপবালাকে ভয় করে।

গোলাপবালা তাকায় এবার হতবাক্ রুগ্ন দুর্বল কামিনীর দিকে,—তুমিও কি একবার ধরতি পারলে না গা ছেলেটারে! চোখের সামনে দেখতিছ চুপ করে। রাক্ষসী মা কি আর সাধে বলতে ইচ্ছে হয়। মুখে আগুন অমন মায়ের। পেটে ধরলি মা হয়ে গেল!

কামিনী পাণ্ডুর মুখে শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে গোলাপবালার দিকে। কিই বা বলবার আছে ওর। আর বললেই বা বুঝবে কে? গোলাপ কি তার স্বামীকে চেনে না? জানে না কি যে কামিনীর হাতপা ঠাণ্ডা হয়ে যায় দেওরের গর্জনের সামনে।

কামিনী কালো দুর্বল, কুৎসিত হতভাগী।

গোলাপ রূপসী, গোলাপের মতো গায়ের রঙ। ঝাঁজালো রূপ আর ঝাঁজালো কথায় যেন ফেটে পড়ছে। ওর ভাগ্যকে ঈর্ষা কামিনী করে না। তবু গোলাপ যে তার ঠিক অবস্থাটা সব সময় বোঝে না—যেন এইটেই তার মনে বড় বেশি লাগে।

ওর ঠোঁট দুটো কাঁপে। কথা বলতে পারে না।

সুধন্য রাগে গড়গড় করতে করতে চলে যায়।

লোটন চোখ মুছতে মুছতে কাকীমার সঙ্গে চলে যায়।

টুলুও পিছন পিছন যায়। যদি সরের ভাগ কিছুটা মেলে।

রাত্রে টুলু আর লোটন একসঙ্গেই শোয়। দুজনেই শুয়েছে।

টুলু কথা বলতে ভয় পাচ্ছে আজ। লোটনও কথা বলছে না।

দুজনেই জেগে শুয়ে আছে।

হঠাৎ নাক শুঁকতে শুঁকতে টুলু বলে যেন আপন মনে,—পাকা কলার গন্ধ পাচ্ছি যেন!

লোটন চুপ করে থাকে।

টুলু একটু উসখুস করে বলে,—ভট্চাযদের বাগান থেকে কলার কাঁদিটা কি নে আসা হল?

লোটনের উদ্দেশ্যেই কথাটা বলা হল। তবু লোটন নীরব।

আবার দুচারবার শোঁকে টুলু।

লোটনা!

কি?—উত্তর দেয় লোটন যেন বিরক্ত হয়ে।

কি সোঁদা গন্ধ মাইরি!

তোর নাকে সর্দি হয়েছে, তাই অমন গন্ধ পাচ্ছিস।

টুলু আবার এপাশ ওপাশ।

লোটন বলে,—বোধ হয় কোন হনুমান-টনুমান থুয়ে গেছে মাচার ওপর।

এতক্ষণে টুলু বোঝে যে হনুমানটি কে?

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে থাকে।

টুলু এবার লোটনকে ঠেলা মারে, দেখে ঘুমিয়েছে কিনা।

লোটন অসাড় হয়ে পড়ে আছে।

আস্তে আস্তে উঠে বাইরে থেকে মইটা এনে মাচার ওপর ওঠে টুলু।

ওপরে উঠেই সামনে কলার কাঁদিটা হাতে ঠেকে। গোটাকতক ছাড়িয়ে খেয়ে ফেলে। পেট ভরে ওঠে।

বড় বড় কানাইবাঁশি কলা।

কিছু কলা কোঁচড়ে নিয়ে এবার নামবার জন্যে পা বাড়ায় টুলু। কিন্তু মই কই?

পাটা ডান দিক থেকে বাঁ দিকে, বাঁ দিক থেকে ডান দিকে—দু-তিনবার ঘোরায়।

মই পায়ে ঠেকে না।

সেরেছে। বেড়ার দিকে পা চালায়।

বেড়ায়ও মই নেই।

• ঘাম ছোটে টুলুর। কিছুক্ষণ পর ও বুঝতে পারে যে মইটা কে সরিয়েছে। অ্যাই লোটনা!

লোটন নীরব।

লোটন! তোর পায়ে পড়ি ভাই! অ লোটন।

লোটন শুয়েই থাকে। একটু সাড়াও পাওয়া যায় না ওর।

অ্যাই লোটন! গড় করি ভাই! দে মইটা তুলে।

লোটনের গলার আওয়াজ পাওয়া যায় এতক্ষণে,—কেন, আরো বাবাকে বলে মার খাওয়াও।

মাইরি বলছি, আর যদি কখনও বাবাকে বলিচি তো নাকখত দোব। দে মইটা তুলে—

উহুঁ ভররাত থাকো মাচায়।

টুলুর গলা প্রায় কাঁদো-কাঁদো,—মরে যাব তালে, বড় বড় ডেঁয়ো আছে মাচায়।

তবে মরো, আমার কি ?

তুই ভাই হয়ে এমন কথা বললি, প্রাণে লাগল নি ?

ও সব যাত্তারা নবীন তরফদারের দলে গিয়ে করো!

টুলু বলে,—কান মুলচি, আর করব না।

ভাল করে মলো, শব্দ পাচ্ছি না যে।

সত্যি বলচি, কান মুলচি। শব্দ না হলে আমি কি করব বল ?

লোটন মইটা উঠিয়ে দেয়, মাচায়। টুলু নেমে আসে এক কোঁচড় কলা নিয়ে। এসেই লোটনকে গোটা চারেক কলা দেয়,—নে খা।

ভোর হতে না হতেই বেরিয়ে যায় লোটন পানাপুকুরের উদ্দেশ্যে। ছোট তরফের বাবুদের বাড়ির পিছনে পানাপুকুর। সেখানে কচ্ছপের ডিম পাওয়া যাবে পাড়ের গর্তে গর্তে। লোটন একটা বাঁশের লম্বা লাঠি নিয়ে পুকুরের ধারে চলে আসে। তখনও পুকুরের ধারে হাঁসের দল আসেনি। বাবুদের বাগানের ভেতর কাঠের খুপড়ি থেকে তারা ছাড়া পাবে। মালী খুলে দেবে খুপড়ি,

তারপর আসবে ছুটতে ছুটতে হাঁসের ঝাঁক। শাদা পাখনা নেড়ে নাচাতে নাচাতে। এক একটা হাঁসের পায়ে আবার রুপোর নূপুর বাঁধা, ছোটবাবুর শখ। ঝুমঝুম শব্দ হয় পায়ে। পেছনে তাড়া করতে ভারী মজা লাগে লোটনের।

এখনও আসেনি হাঁসগুলো। লোটন পুকুরের ধারে ঢালু মাটির গর্তে গর্তে বাঁশের লাঠিটা দিয়ে খোঁচায়। যদি কচ্ছপের সন্ধান মেলে। একটা গর্তেও আজ কচ্ছপের সাড়া নেই। লাঠিটাকে নইলে মুখ দিয়ে কামড়ে ধরত। খোঁচা লাগলেই এখন গর্ত বেড়িয়ে জলে পড়ত লাফিয়ে। লোটন খানিকক্ষণ এধার ওধার করে পুকুরধারের রাস্তা ধরে চলতে থাকে, ষোড়শী ঝির চালা পেরিয়ে ধোপাদের বাড়ি পিছনে ফেলে অনেকটা চলে আসে ও। একটা নালার কাছে এসে দাঁড়ায়। নালাটা বিলের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে দীঘি থেকে। অনেক জল। কোমরে কাপড় তুলেও পার হওয়া যায় না। লোটন অপেক্ষা করে ওপারের ডিঙিটা নিয়ে যদি কেউ এপারে আসে, তবে পার হওয়া যায় নালাটা। যাবে ও চালতেতলার বুড়োশিব-মন্দিরে। বুড়োশিবের ভাঙা মন্দিরটায় ও এমন মাঝে মাঝেই যায় মন্দির পরিষ্কার করে। বসে থাকে সেখানে। বুড়োশিবের গায়ে হাত বোলায়। আর কথা বলে। যত মনের কথা ওর আছে আর যে কথা সংসারে কাউকে বলা যায় না। পাথরটা নীরবে শুনে যায়। এমন নীরব শ্রোতা কি আর পৃথিবীতে মেলে! এর কাছে বসে কত আরাম। নড়বে না, চড়বে না, হুঁ নয়। আজ যাবে হোথায় লোটন।

ডিঙিটা নিয়ে আসে কাত্তিক ধোপা। লগিটা রেখে নামতে যাবে, ইতি-মধ্যে লোটনের পাশ থেকে একজন খেঁকিয়ে ওঠে,—ছুঁবি ছুঁবি হারামজাদা, পুজোয় যাচ্ছি।

কাতু ধোপা চমকে লগির টাল সামলাতে না পেরে ছুঁয়ে দেয় লোকটিকে। লোকটি কাতুর ঘাড়টা ধরে ধাক্কা মেরে জলে ফেলে দেয়। লোটন তাকিয়ে দেখে লোকটি আর কেউ নয় সেই রাত্রের দেখা ভূতের মতো নটবর মুৎসুদ্দি। ইস্কুলের থার্ড পণ্ডিত।

লোটনের কানদুটো লাল হয়ে ওঠে। অকস্মাৎ লোটন অবশের মতো হয়ে

'ওরে বাপরে', বলতে বলতে ঝড়ের বাঁশের মতো মুৎসুদ্দির ঘাড়ের ওপর পড়ে। মুৎসুদ্দি পবিত্র গরদ পরিধান করে এসেছে। সেই সুদ্ধুই পবিত্র নালার ঘোলা জলের ভেতর পড়ে যায়। কাদার জলে ভিজে কিঞ্চিদধিক ঘোলা জল গলাধঃকরণ করে কর্ণবিবরে জল যাবার দরুন কান ভোঁ-ভোঁ করতে করতে মুৎসুদ্দি যখন জল থেকে ওঠে, লোটন ততক্ষণে সাঁতরে ওপারে গিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ছোট ভিজে কাপড়খানা দিয়ে পরিষ্কার করতে থাকে বুড়োশিব পাথরটিকে।

জানিস দিয়েছি আজ বেটাকে ফেলে। আমরা ছোটজাত, আমরা ছুঁয়ে দিলে ঠাকুর পুজো হবে না! যত সব বাজে কথা! এই তো তোকে ছুঁয়ে রয়েছি, তুই কি রাগ কচ্ছিস? রাগ করিস তো বল আর আসব নি।

পাথরটা সমান নীরব শ্রোতা।

মাকে নিয়েই হয়েছে আমার যত ঝামেলা। জানিস বুড়ো, মা-টা মরলে কি কিছু হলে তো বেঁচে যাই। যে দিকে দু চোখ যায় চলে যেতে পারি। কাঁহাতক আর ভাল লাগে গালাগাল খ্যাচম্যাচ। মা-টাকে নিয়ে কি করি ভেবে পাইনে।

বলতে বলতে ওর কিশোর-কণ্ঠে কোথায় যেন একটু বেদনার আভাস পাওয়া যায়। মনের জমা মেঘ সব যেন জল হয়ে ঝরে পড়ছে এই পাথরটার ওপর। পাথরটা খুশি কি অখুশি কে জানে। লোটন খুশি। বলতে পেরে খুশি,—সব জমা-করা গ্লানি এইখানে উজাড় করে দিয়ে ভারি আরাম।

এ পাথরটাই ওর জীবনের সবচেয়ে বড় বন্ধু। সবচেয়ে ভালবাসে যেন ওকে। আর কারো কাছে এত কথা বলতে গেলে হয়তো বা কান মুলে দিত। বুড়োশিব চুপ করে থাকে শুধু।

বহুক্ষণ ওই ভাঙা মন্দিরের পাথরটার পরিচর্যা করে দুপুরের একটু আগে বাড়ি ফেরে লোটন।

মা ভাত দাও! এসেই রান্নাঘরের দিকে যায় লোটন। রান্নাটা ওর মা-ই করে বহুকাল থেকে। কামিনীবালা লোটনকে ভেতরে ডাকে,—তুই কি সর্বনাশ করিচিস বাপু?

কেন কি করিচি ?

মুৎস্থুদ্দি মশাইয়ের পুজো নষ্ট করে দিয়েছিস! তোকে নিয়ে কি করি বলদিনি ?

লোটন একটুও ঘাবড়ায় না,—বলে,—কেন, এসেছিল বুঝি নালিশ করতে ?

তা এসবে নি!

কাকে নালিশ জানালে ?

তোর কপাল মুখপোড়া! তোকে নিয়ে হয়েচে আমার মরণ!

তেনা আমার কাঁচকলা করবে, তুমি ভাত দাও।

কামিনীবালা লোটনের দুঃসাহসে প্রায় শিউরে ওঠে,—অমন কথা মুখে আনিসনি আর।

মুখে আনব নি তো কি নাকে কানে আনব। দাও ভাত দাও।

মাটিতেই খেতে বসে পড়ে লোটন।

ভাত দিতে দিতে বলে কামিনীবালা,—পাঠশালায় তো গেলিনি ?

হাসতে হাসতে বলে লোটন,—পাঠশালায় গেলে কি আর পিঠটা আমার আস্ত থাকবে ভেবেচ ? মুৎস্থুদ্দি পণ্ডিত যা চটে আছে, বেতখানা ভাঙবে আমার পিঠে। আচ্ছা, ওরা আমাদের ছোটলোক বলে ঘেন্না করে কেন মা ?

প্রশ্নটা লোটনের অত্যন্ত সরল, তবু কামিনীবালা একটু মুশকিলে পড়ে জবাব দিতে। এমন কথা যে তারও মনে না হয়েছে কখনও, তা নয়। কিন্তু সেটা এতই আলগা যে মনে ভাল করে বসতে না বসতেই কথাটা মিলিয়ে গেছে নিরুত্তরে।

বলে সে,—আমরা যে ছোট জাত বাবা।

লোটনের মনঃপুত হয় না কথাটা,—ছোটজাত কি গায়ে লেখা থাকে ? কই আমার গায়ে কোথায় লেখা দেখাও। আমায় বাবুদের বাড়ির সুনুর মতো ভাল ফর্সাপানা জামাকাপড় পরাও, কেমন না আমায় ভদ্দরলোক বলে দেখি।

বাবুদের বাড়ির মেজবাবুর ট্যারা ছেলে সুনুর দাপটটা সইতে পারে না লোটন। তাই তার কথাটাই প্রথম মনে আসে। সুনু যখন ফুটবলমাঠে একটা ছড়ি নিয়ে বেড়ায়, আর সকলের ওপর লম্ফঝম্ফ করে, লোটন সইতে পারে না।

ছড়ি দিয়ে তাকে একদিন মাথায় এক ঘা বসিয়েই দিল। ট্যারা চোকটা বড় বড় করে বললে,—অমন গোলটা তুই নষ্ট করলি কেন উল্লুক !

লোটন ছড়িটা টেনে ধরেছিল। উলটে মেরেই বসত।

কিন্তু অকস্মাৎ মনে পড়ল যে স্বম্বুর গায়ে হাত তোলার মানেটা অতি ভয়াবহ। হয়তো তাকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলে রেখে দেবে জমিদার-বাড়ির চাতালে ভরদিন ; অথবা নায়েবের হুকুমে গুপীমোড়ল তার মাথা ন্যাড়া করে ল্যাংটা করে ছেড়ে দেবে হাটের ভেতর হাত দুটো বেঁধে।

সামলে নিয়েছিল লোটন।

কিন্তু মনকে সামলাতে পারেনি। শিশু-মন তার কেবলই বিদ্রোহ করেছে। এমন একটা বিসদৃশ ব্যাপারের কোন মানেই তার মাথায় ঢোকেনি।

কাউকে বললে হয়তো হেসে উঠবে,—তাকে বলবে মাথা মোটা। জমিদারের ছেলের গায়ে হাত ! তার আবার মানে খোঁজা ! আরে বাপরে !

কিন্তু 'আরে বাপরে' বললে তো আর সব বলা হল না। লোটনের মন বোঝে না। লোটনের মাও আজ লোটনকে এর সঠিক জবাব দিতে পারলে না। শুধু হেসে বললে,—ও ! ভদ্দরলোক হবার কত শখ। তবে নেকাপড়া কর, তবে তো ! ভদ্দর কি অমনি হয়।

কই লেখাপড়াও তো সুম্বু তার চেয়ে বেশি করতে পারেনি। দ্বিতীয় ভাগই তো ছাড়াতে পারল না।

লোটন চুপ করে খেয়ে যায়।

বহু চাপা প্রশ্ন উঁকি দিতে চায় ওর মনে।

বাবা যে কবে মরে গেল মনে নেই লোটনের। তার জন্মের পরই নাকি বাবা মরেছে। সেদিক থেকে তাকে ভাগ্যহীন বলতে কেউ তো ত্রুটি করে না। 'বাপখেকো' 'হাড়হাবাতে' 'রাক্কুসে বরাত' এ সব বিশেষণগুলোও গা-সওয়া হয়ে গেছে ! তবু কথাগুলোর কোন কারণ খুঁজে পায় না ও। বাবা মরে গেল, তা ওর দোষটা কোন জায়গায় হল ? ও তো বাবাকে মারেনি !

তারপর থেকে গঞ্জনা। খুড়ো হাত উঁচিয়েই আছে। একটু থেকে একট-

হলেই প্রহার। খুড়ী হাতপা রোদে পুইয়ে তেল-সিঁথি করে পান খেয়ে যেটুকু সময় পায়, সেটুকু সময় লোটনের উপর সদয় ব্যবহারই করে। সেটাও যেন নিতান্ত কৃপা। তবু এক একসময় মনে হয় খুড়ীর প্রাণের সরস ছোঁয়া ওর প্রাণ স্পর্শ করে কখনও কখনও পুর্ণিমার চাঁদ ভাল লাগার মতো। লোটনকে ভাল লাগে। মায়া জমে ওঠে মনের আনাচে কানাচে। আহা, বাপ-মরা ছেলেটার কেউ নেই!

খুড়োকে এক আধসময় বারণ করে মারতে,—আহা অত মেরো নি।

খুড়ো গর্জে ওঠে,—না গোঁতালে ছেলে ভাল হয় ?

তা না হোক,—খুড়ীর জিদের কাছে খুড়োর পরাজয় হয়।

ইচ্ছে হয় লোটনের টুলুকে ধরে ঘা কত লাগায়।

বলতে এলে বলবে,—না গোঁতালে ছেলে ভাল হবে নি।

মায়ের তো মুখে রা নেই। জন্ম থেকে যেন বোবা। খুড়ো মশাইকে দেখলে মায়ের ঠোঁট নীল হয়ে যায়। হাতপা কাঁপে। খুড়ীমাকে তোশামোদ করতে করতেই দিনরাত প্রাণান্ত। কামিনীবালার সাড়াই পাওয়া যায় না দিনরাত।

ভোর থেকে সংসারের বাসন মাজা জল তোলা ঘর লেপা, তারপর রান্না।

সূর্য উঠে ডুবে যায়। কামিনীবালার দিনরাত একাকার। সূর্য ওঠে না ডোবে না। শুধু কাজ। দিনে অনেক বেলায় দুটিখানি ভাত খায়, কোনদিন খায় না। রাত অনেক হয়ে গেলে এক গেলাস জল খেয়ে শুয়ে পড়ে রান্না-ঘরেরই এক কোণে। খুড়োর কুকুরটাও বোধ হয় এর চেয়ে ভাল থাকে।

লোটনের চোয়াল দুটো কঠিন হয়ে আসে ভাবতে ভাবতে।

চোদ্দ বছর বয়েস হল তার। কিছু কিছু সে বুঝতে পারে।

দিন কতক আগেই তো এক কাণ্ড হয়ে গেল।

মা গিয়েছিল ঘাটে। ভাতটা পুড়ে গেছে ইতিমধ্যে উনুনের ওপর। খুড়ীমা পোড়া গন্ধ পেয়ে রান্নাঘরে মাকে না দেখে হাঁড়িটা ধরে ফেলে দেয় উঠোনে।

বেলা তখন অনেক হবে।

খুড়োও দোকান থেকে ফিরেছে।

• সামনে ভাতের হাড়ি ভাঙা দেখে বলে, কি হল !

হবে আর কি ! ভাত পুড়ে আঙার হয়ে গেছে। এমন অলক্ষীকে সংসারে রেখেচ—সব পুড়িয়ে জ্বালিয়ে দিলে গা। নিজের কপাল তো পুড়েচেই, এখন আমার সব পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।

রক্তচক্ষু সুধন্য বলে,—কোথায় বৌঠান ?

চুলোয়।—বলে গোলাপবালা,—আজই দূর করে দাও বাড়ি থেকে মাগীকে। যাক যেখানে জায়গা থাকে। আমার এখানে এমন আবাগীর জায়গা হবে নি।

গোলাপবালা মুখ খুললে পানসির মতো চলে তরতর করে।

ইতিমধ্যে ঘাট থেকে এক ঘড়া জল নিয়ে আসে কামিনী।

সুধন্য রাগে আর কিছু করতে না পেরে কামিনীর কাঁখ থেকে ঘড়াটা নিয়ে ছুম করে ফেলে কামিনীর পায়ের ওপর। পায়ের দুটো আঙুল থেঁতলে যায়।

মাগো ! বলে বসে পড়ে কামিনী।

সুধন্য রাগে গড়গড় করতে করতে ঘরে ঢুকে যায় !

গোলাপবালার মুখ তখনও চলছে,—কোথায় গিয়েচিলে শুনি চুল এলো করে কাঁকে ঘড়া নিয়ে রাইবাগিনী সেজে ? দু সের চালের ভাত যে পুড়ে গেল। খেসারত দেবে কেডা ? এখানে ওসব ঢঙ চলবে নি। ঢঙ করতে হয়, অন্য ডেরায় গিয়ে করো।

বোবার মতো বসে থাকে কামিনী।

সুধন্য চেঁচিয়ে বলে,—বলে দাও তেনাকে, তিন দিন ভাত খেতে পাবে নি। ওই চাল না খেয়ে শোধ করতে হবে। যে যেমন, তার সঙ্গে তেমন।

গোলাপ চলে যায়।

কামিনী ওই পা নিয়েই ওঠে। হাঁড়ি-ভাত সব পরিষ্কার করে ঘড়া তুলে আবার ভাত চড়ায়। চাল নিতে গেলে গোলাপবালা কথা বলে না। একজনের চাল কম করে দেয় রাঁধতে। কামিনী বুঝেও চুপ করে থাকে।

সেদিন খাওয়া হয় না।

লোটন সব দেখেছিল। কথা বলেনি।

রাতে ঘুমোতে গিয়ে ঘুমোতে পারে না লোটন। বিছানায় এপাশ ওপাশ ছটফট করে। মায়ের পেটটা বোধহয় ক্ষিদেয় জ্বলে যাচ্ছে। দিনরাত খেতে দেয় নি কিছু। লোটন কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে উঠে পড়ে। সোজা চলে যায় অন্ধকারের ভেতর ঘোষালদের বাগানে। পেয়ারা গাছটায় অন্ধকারেই উঠে পড়ে তরতর করে। গোটা ছয়েক পেয়ারা নিয়ে নেমে আসে।

তারপর চলে রান্নাঘরের দিকে। মা যেখানে শুয়ে আছে।

ঘরের দোরটা ভেজানো।

ঘরে ঢোকে লোটন। মায়ের পায়ের কাছে গিয়ে নাড়া দেয়,—মা! ওমা!

কামিনী চমকে উঠে পড়ে।—কে?

আমি। এই নে খা।

পেয়ারা কটা মায়ের হাতে দেয়।

কামিনী অন্ধকারে অকস্মাৎ লোটনকে বুকে জড়িয়ে ধরে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

লোটন ধমকায়,—নে ছাড়! কাঁদিসনি আর। কেউ শুনতে পাবে। খেয়ে নে প্যায়রা কটা।

কামিনী শুধু বলতে পারে,—তুই কবে বড হবি লোটন!

হব হব। বড় তো হয়ে গেচি, কাঁদিসনি।

কামিনী পেয়ারা কটা হাতে নিয়ে বলে,—যা ঘুমো গা।

লোটন বলে,—পা-টায় খুব ব্যথা লাগচে, না মা?

না কিছু হয় নি।

তুই খেতে থাক, আমি গ্যাদার পাতা নিয়ে আসি। গাঁদার পাতা থেঁতো করে দিয়ে দে। সেরে যাবানে।

কামিনী বারণ করে,—কোথায় আবার অন্ধকারে গ্যাদাপাতা পাবি। সাপ-খোপের ভয় আছে। যা ঘরে শুগে যা।

লোটন বেরিয়ে যায়।

• কিছুক্ষণ পর কোথা থেকে গাঁদাপাতা যোগাড় করে এনে মুখে চিবিয়ে মায়ের পায়ে লাগিয়ে দেয়।

নে, খেয়ে শুয়ে পড। কাল দেখবি ব্যথা কমে গেছে। আমার অমন হরদম্ কেটে যায় ছড়ে যায়। গাঁদার পাতা চিবিয়ে দিলেই সেরে যায়।

ঘর থেকে বেরিয়ে যায় লোটন। বাইরের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

আবার রাত যায়, সূর্য ওঠে। ডোবে।

লোটনের মনে মেঘ জমে। শুধুই জমে।

আরও কত দিনের কত কথা জমা আছে। ভুলতে পারেনি ও। চোদ্দ বছরের নিদারুণ অভিজ্ঞতা ভোলা যায় না।

ভাত খেতে বসে লোটনের ভাত খাওয়া আর ভাল করে হয় না। উঠে পড়ে।

কামিনী ডাকে,—কিরে, পাতে ভাত রইল কেন?

ভাল লাগছে না আর।

কামিনী ভয়ে ভয়ে বলে,—তোর খুড়ি দেখলি যে খেয়ে ফেলবানে। বলবে পাতে ফেলে ভাত নষ্ট হল। খেয়ে যা বাবা।

না।

চলে যায় লোটন।

দুপুরে মাথার ওপব তীব্র সূর্যের তাপ নিয়ে বেরোয় বিলের ধারে গুলতি হাতে চখাচখির সন্ধানে। বিলের ধারে ধারে ক্ষেতের ধারে ঘুরে বেডায় উদ্দেশ্যবিহীন শূন্য মনে। এমন নিরুদ্দেশ ঘুরে বেডানো ওর মাঝে মাঝে ভারি ভাল লাগে। মনটা যেন হালকা হয়ে যায়।

মাছরাঙা আর জলপিপি উডে যায় বিলের জলের ওপর দিয়ে, মাঝে মাঝে ছোঁ মারে কোন পুঁটি বা মৌরলাকে ঠোঁটে টেনে আনতে। কোথাও বা শাদা গরু ক্ষেতের ওপর ঘুরে বেড়ায় ঘাস আর আগাছা খেয়ে। তার পিঠের ওপর বসে কাক আর শালিক নাচে। বিরক্ত হয়ে দু একবার ল্যাজের ঝাপটা দেয় শুধু গরু দুটো। বিলের অল্প জলে কাদায় কোথাও বা কাদা মেখে বসে থাকে বড বড় এক পাল মোষ—ছাইমাথা শান্ত সাঁওতাল সন্ন্যাসীর মতো। রোদে

আর কাদায় আরামে বসে বসে ঝিমোয় ওরা। প্রশান্ত,—সময়ের অন্ত নেই যেন ওদের কাছে।

লোটন ঘুরে বেড়ায়।

নয়াহাটের বটতলায় গিয়ে বসে জিরোয় কিছুক্ষণ। লাল কাঠপিঁপড়ে কামড়াতেই উঠে পড়ে।

এবার যায় নালার ধারে তপ্ত বালির ওপর তরমুজের ক্ষেতের দিকে।

কচকচে বালি কাচের গুঁড়োর মতো ঝিক্‌মিক করছে তীব্র রোদে। পা পুড়ে যায়। তার ওপর তরমুজের লতা। ছোট বড় নানা ধরনের তরমুজ ফলে আছে। পাহারাদারের তালপাতার মাচাটার দিকে তাকায় লোটন। না, বোধহয় কেউ নেই এখন। ঘরে খেতে গেছে পাহারাদার।

একটা তরমুজের বোঁটা মোড়াতে থাকে লোটন।

বড় শক্ত বোঁটা ছেঁড়ে না। অনেকক্ষণ মুচড়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলে। তরমুজটা নিয়ে ছুট্। এক ছুটে চলে আসে একটা বটগাছতলায়। বসে বসে তরমুজটা খেয়ে নেয়। রাত বেশি হলে বাড়ি যাবে। যাতে খুড়ো টের না পায়। মুৎসুদ্দির নালিশের জের নইলে চলবে ওর পিঠের ওপর দিয়ে সমস্ত সন্ধ্যায়।

আর ভাল লাগে না লোটনের। কোথাও চলে গেলে হয়। যেত চলে কিন্তু মায়ের জন্যই যে মুশকিল।

সন্ধ্যার পর বাইরের ঘরে ঢুকে চুপিচুপি শুয়ে পড়ে লোটন।

ঘরে আজ টুলু নেই। বোধহয় লোটনের আসতে দেরি দেখে ওর মায়ের কাছে গিয়ে শুয়েছে।

সকালে উঠতে লোটনের একটু দেরি হয়ে গিয়েছে।

বেরোতে গিয়ে দেখে দরজা বন্ধ। বাইরে থেকে কে বন্ধ করে দিয়ে গেছে। দরজা ধরে ঝাঁকাতে থাকে লোটন।

বাইরে বোধহয় খুড়ো দাঁতন করছিল। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে চোখ বড় বড় করে বলে—ফের দোর ঠেলবি তো মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেবানে। তালা

দিয়ে রাখব আজ তোকে দিনরাত। পণ্ডিত মশাইয়ের পুজো নষ্ট করে দিয়েছিস!

লোটন গিয়ে আবার শুয়ে পড়ে।

ঠিক আছে।

সুধন্য চলে যায়। পরামর্শটা গোলাপবালা ভালই দিয়েছে। বুদ্ধিতে ওর সঙ্গে পারবার জো নেই। স্ত্রীবুদ্ধির গর্বে সুধন্য গর্বিত বোধ করে।

দিন পার হয়ে যায়।

লোটন শুয়ে বসে কোনমতে কাটায়।

গোলাপবালা যখন সুধন্যর সঙ্গে দিবানিদ্রার জন্যে ঘরে খিল দেয়, সেই ফাঁকে কামিনীবালা বাইরে ঘরে এসে জানালা দিয়ে ডাকে,—এই লোটনা।

কি মা!

ভাত দিয়ে যাব? রেখেচি চাট্টিখানি হাঁড়িতে।

না না, আমি খেইচি।

কি খেলি?

কলা।

কলা কোত্থেকে পেলি?

ওসব তুমি বুঝবে নি। যাও এখন।

কামিনী তবু দাঁড়িয়ে থাকে।

লোটন বালিশের তলা থেকে আরও গোটা ছয়েক বড় বড় কানাইবাঁশী কলা বার করে মায়ের সামনেই খেতে থাকে। জানে যে সামনে না খেলে মায়ের মন উঠবে না। ভাববে মিছে কথা বলেছে। মা তো জানে না যে বিপদকালে চালাবার জন্যে কিছু কলা শশা পেয়ারা মাচার ওপর মজুত থাকে।

দুদিন ঘরে আটকে রাখলেও তার কাঁচকলা।

বেঁচে থাক ভট্চাযদের বাগানের কলাগাছ। এখনও মাচার ওপর গোটা পনেরো কলার বোঁটায় চুন দেয়া আছে পাকবার জন্যে।

ওদিকে সুধন্য খুব খুশি, গোলাপবালাকে আদর করে বলছে,—ছোঁড়াটা আজ রাম জব্দ হবে। তোমার বুদ্ধি নইলে কি আর আমার বুদ্ধিতে কুলুত?

গোলাপবালা ভেতরে রসিয়ে ওঠে, তবু বাইরে ঝাঁজ—থাক্ আদিখ্যেতা, জাত কৈবত্তের মেয়ে, তোমার চোদ্দপুরুষের মতো রসগোল্লায় পাক দিয়ে তো আর জন্ম কাটেনি?

আবার চোদ্দপুরুষ টুরুষ কেন!—সুধন্য মৃদু আপত্তি করতে চায়।

গোলাপবালা কাঁথাটা পায়ের ওপর টেনে পাশ ফিরে শোয়।

সেবার দুর্গাপুজোয় জমিদারবাড়ি তিনরাত যাত্রা গান হচ্ছিল। জমিদার-প্রাসাদের সামনের মাঠে সামিয়ানা খাটানো হয়েছে। চারিদিকে সতরঞ্চি। মাঝে খান আষ্টেক চৌকি। তার ওপর যাত্রার অভিনয় হবে। প্রাসাদের লম্বা বারান্দায় চিক টাঙানো। বারান্দার ভেতর মেয়েদের বসবার জায়গা।

লোটনরা দুপুর থেকেই মাঠের সামিয়ানার নীচে দৌড়োদৌড়ি শুরু করেছে। চৌকির ওপর দাঁড়িয়ে কেউ বা যাত্রার ঢঙে হাত-পা নাড়ছে। রাজা সাজছে, রাণী সাজছে, সাজছে মন্ত্রী।

যাত্রার দলের লোক এসে গেছে প্রাসাদের বৈঠকখানার পশ্চিমের দিকের একখানা বড় ঘরে। পোঁটলা প্যাটরা নিয়ে তারা মহলা দিচ্ছে যাত্রার। মহিষাসুরবধ পালা গাইবে আছে। গুঁপো অধিকারী অসুরের পার্ট করবে। বিখ্যাত অসুর।

ওঃ! খাঁড়াখানা যখন তোলে!—বললে হারান।

লোটন বলে,—দেখেছিস তুই?

তবে? পাটুলীতে মামার বাড়ি ছেলুম, দেখলুম অসুরের পাট। এ দলই গেছল কিনা!

কত রাত্তিরে আরম্ভ হল?

সন্ধে নাগাদ।

তবে মজা, ঘুম পাবে না।—সবাই ভারি খুশী।

হঠাৎ লোটন বলে,—দ্যাখ, দ্যাখ, ওই ছোঁড়াটা—

সবাই তাকায়। যাত্রাদলের ঘর থেকে একটা বাচ্চা ছেলেকে কান ধরে

বাইরে এনে দাঁড় করিয়ে দিলে অধিকারী। দুপুরের তেজী রোদ্দুরে ছেলেটা ঘামছে।

হারান বললে,—আরে! এত কেষ্ট।

কেষ্ট মানে!

ও-ই মাথুর পালায় কেষ্টর পার্ট করেছেল। গানের কি গলা! আমাদের থাবু মাস্টারের বাবা!

লোটন এগোয়। ওরা সবাই এগোয়।

ছেলেটা কাঁদছে।

কাঁদছিস কেনরে?

ছেলেটা কাঁদে রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে। কথা বলে না।

লোটন দলবল নিয়ে তখন সতেজ,—বল না উল্লুক।

গালাগাল কোরনি বলচি!—ছেলেটা ফোঁস করে ওঠে।

লোটন হাসে—কি করবি শুনি?

মাস্টারকে বলে দোব।

তোর মাস্টার আমার ঘেঁচু করবে। কাঁদচিস কেন বল না?

তোর বাবার খেয়ে কাঁদছি? ভাগ।

ওরে বিচ্চু! এখনো টের পাওনি ধন কোন্ গাঁয়ে এসেচ!

বলে লোটন চলে যায়।

কিছুক্ষণ কোথাও কিছু নেই। ভটাভট্ কতগুলো ঢেলা এসে ছেলেটার গায়ে লাগে।

বাপরে! করতে করতে ছেলেটা ঘরে ঢোকে।

লোটনরা ঘরের পিছনের দিকের ছোট খুপরির ভেতর দিয়ে উঁকি মারে। দেখে ছেলেটার কান দুটো চেপে ধরে বলছে ওদের মাস্টার,—চলে এলি যে বড়।

ঢেলা মারলে যে!—কাঁদ-কাঁদ হয়ে ছেলেটা বলে।

কান ছেড়ে দিয়ে বলে মাস্টার—আবার নাচ।

ছেলেটা ঘুঙুর বাঁধে পায়ে।

মাস্টার শুরু করে,—এক-দুই-তিন।

ঢোলক ধরে মাস্টার।

ছেলেটা নাচতে থাকে ঢোলকের তালে তালে।

সখীর পাট করবে বোধ হয়!—ফিস্ ফিস্ করে বলে হারান।

চুপ মার।

ক্যাংলা উঁকি মেরে বলে,—ছাখ লোটনা, কি মার মারছে ছেলেটাকে।

লোটন খুপরির ভেতর দিকে উঁকি দেয় আবার।

নাচের তাল ভুল হয়েছে। পায়ের গাঁটে কয়েক ঘা বেত পড়ে। ছেলেটা কঁকিয়ে ওঠে। জোরে কাঁদবারও উপায় নেই বোধ হয়!

চোখ মুছতে মুছতেই আবার নাচতে হয়।

আবার ভুল।

এবার মাস্টার ছেলেটাকে হিড়-হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে বাইরে রৌদ্রে আবার একপায়ে দাঁড় করিয়ে দেয়।

লোটনের মনটা ভিজে ওঠে সমবেদনায়।

সামনে এসে বলে ছেলেটাকে—খুব মারলে তোকে শালা। কে ওটা? মাস্টার?

হুঁ। চোখের জল মুছে গাল ফুলিয়ে বলে ছেলেটা।

চোখ দুটো ওর রাঙা হয়ে উঠেছে কেঁদে কেঁদে। পেটমোটা হাড়সরু বাচ্চা ছেলে।

ঘর কোথাকে তোদের? কে আছে তোর?

মা।

বাবা নেই?—শুধোয় লোটন।

না।

আমারও নেই। বলে লোটন,—কটাকা মাইনে দেয়?

ছেলেটা বলে,—আট টাকা, খাওয়া, জামা-কাপড়।

টাকা কি করিস?

মাকে পাঠাই। আর থাকবোনি এ দলে।

• ধুস! থাকবিনে কেন? তোর মেডেল আছে?

হুঁ। তিনটে! একটা ময়ালপুরের বাবুদের বাড়ি থেকে, আর একটা কি বলে ওই যে হোথাকে—

ওকে থামিয়ে বলে লোটন,—মেডেল দেখে তোর মা কি বলে?

সবাইকে দেখায়! আর বালিশের তলায় রেখে রাত্তিরে শোয়। যদি হারিয়ে যায়। বলতে বলতে ছেলেটার চোখ দুটো স্তিমিত হয়ে আসে। শান্‌কিপুকুরের মেঠো ঘরে এক বিধবার জলভরা চোখ দুটো ওর কিশোর মনের ওপর ভেসে ওঠে। কে জানে কবে আবার সেই চোখের মমতা ওর সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়বে নীরবে। বর্ষার ছুটি পাবে, তখন যাবে দেশে।

লোটন ওকে আশ্বাস দেয়,—কিছু ভাবিসনে, তোদের মাস্টারকে আজ এক হাত দেখে নোব। কিসের পাট করবে ও।

মহিষাসুরের পাট!

ঠিক আছে। লোটন, হারান, ক্যাংলা, হ্যাংলা, ওরা যে যার বাড়ির দিকে এগোয়।

ক্যাংলাকে বলে লোটন,—সন্দেবেলা আসবার সময় কচুর পাতায় কিছু কাঠপিঁপড়ে ধরে পাতার মুখটা বেঁধে আনবি। বুঝলি?

ক্যাংলা ঘাড় নেড়ে চলে যায়।

যাত্রা শুরু হয় যথাসময়ে। তেরপলের তলায় এধারে ওধারে কেরোসিনের ডিবে জ্বালিয়ে পানবিড়ির ছোট ছোট দোকান বসে। মাঝে মাঝে কোথাও বা জিলিপি আর পাঁপড়ভাজা বেচাকেনা চলে। ছ-সাতখানা গাঁ ভেঙে লোক আসে। যাত্রার মঞ্চের সামনেই চেয়ার পাতা কতকগুলো সম্মাননীয় অতিথিদের জন্যে। মাঝের একখানা চেয়ারে জমিদারবাবু। ডান পাশের মঞ্চের চৌকি ঘেঁসে বসে লোটন হারানরা।

মস্ত তলোয়ার ঝুলিয়ে মহিষাসুরের প্রথম আবির্ভাবে হকচকিয়ে যায় সব দর্শক।

বলিহারি! এই না হলে অসুর! টিনের হাতওলা দশভূজার সঙ্গে যুদ্ধ এইবার। তলোয়ার খোলে মহিষাসুর। কচুর পাতা খুলে সবগুলো কাঠ-

পিঁপড়ে ছেড়ে দেয় লোটন মহিষাসুরের পায়ের তলায়। তলোয়ার এক হাতে এক হাতে ঢাল। বীরের বক্তৃতা করছে অসুর। পা বেয়ে উঠে পিঁপড়েগুলো গোটাকতক কামড় বসাতেই মহিষাসুর পা ঝাড়তে থাকে। তাতেও কমে না। দুবার লাফিয়ে নেয়! পিঁপড়েগুলো রেগে কামড়াতে থাকে এবার। আবার লাফায়। দুই হাত বন্ধ। চুলকোতেও পারে না।

ওর অনবরত লাফালাফি দেখে দশভুজা একটু অবাক। একি, মাস্টার এত লাফাচ্ছে কেন? দর্শকরা মনে করে অন্যরকম—কেমন তড়পাচ্ছে দেখেছিস্? এই না হলে পার্ট!

ও যত লাফায় পিঁপড়েগুলো ততই কামড়ায়। অবশেষে তলোয়ার খাপে পুরে পা দুবার তাড়াতাড়ি চুলকে নেয়। তাতেও হয় না। তাকিয়ে দেখে পিঁপড়ে ভর্তি।

দাঁড়া আসচি! এসে তোর মুণ্ড করিব ছেদন।—মা চণ্ডীকে এই বলে মহিষাসুর ভেতরে চলে যায়। গিয়ে পোশাক ছাড়তে থাকে। উরেঃ বাপ্! করতে থাকে।

লোটনরা হেসে লুটোপুটি। শালা ঠিক জব্দ হয়েছে। মহিষাসুর একটু পরেই আবার হাজির হয়।

এবার প্রস্তুত।—বলে যুদ্ধ আরম্ভ করে।

যাত্রা হতে থাকে। জমিদার দেখছে। ভারি জমেছে যাত্রাটা। শুধ্ মাঝে মাঝে খানসামা খানিকটা করে হুইস্কি দিয়ে যায় জমিদারের হাতে—তারপর গড়গড়ার নলটা। বেশ জম্‌জমাটি আসর। ইতিমধ্যে একটা সোরগোল পড়ে যায় আসরে।

—চোর চোর—

একটা চোর ধরা পড়েছে।

কিছুক্ষণের ভেতরেই মাঝবয়েসী একটি লোককে টানতে টানতে নিয়ে আসে সবাই জমিদারের সামনে। সঙ্গে সে-ও আসে যার মেয়ের গলার হারটা ধরে টেনেছিল লোকটা।

• আর একটু হলে ছিনিয়ে নিয়েছিলো হুজুর।

ব্যাটা ঘাগু। দেখছেন না চোখ পিটপিট করচে।

জমিদার সবাইকে থামতে বলে। নিজে সব শোনে। তারপর নায়েবকে হুকুম দেয়,—এটাকে বেঁধে রাখো এই থামের সঙ্গে। কাল সকালে বিচার হবে।

লোকটাকে চৌকির ডানপাশের থামে বাঁধা হয়। ওর ঠিক সামনেই বসে থাকে লোটনদের দল। লোকটা ঘাড় নীচু করে থাকে কিছুক্ষণ বাঁধা অবস্থায়।

লোটন বারে বারে তাকিয়ে দেখে ওর দিকে।

কিছুক্ষণ পর লোকটার চোখ দিয়ে টস টস করে জল পড়তে থাকে। কেউ লক্ষ্য করে না। সবাই যাত্রায় মশগুল।

লোটন একটা অস্বস্তি বোধ করে। দড়িবাঁধা একটা লোক পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছে, কি আপদ!

শুধোয় লোটন,—থাক কোথা?

আবার লোকটার ফোঁপানোর আওয়াজ।

লোটন বিরক্ত হয়,—চুপ মারো। চুরি করে আবার ফ্যাঁচফ্যাঁচ কান্না!

চুরি আমি করিনি। মিছে কথা বলছিনে। মুখ আমার যেন তবে পচে যায়।

তবে কেন ওই মেয়েটার হারটা নিয়ে খেলা করতে গিয়েছিলি?

না কিছুই করিনি।

তবে?

লোকটা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর বলে,—বিশ্বেস যাবে বললে?

লোটন বলে,—বল না।

আমার খাঁদু একছড়া হার চেইয়েছেলো। তা দিতি পারিনি অনেক দিন। মেয়েটার অসুক। বোধ হয় আর বাঁচবে নি। তাই ভাবনু, দেখি এমনি ধারা এক গাছা হার যদি দেখা যায়। হাত দিয়ে দেখছিনু হারছড়া।

ব্যস্? আর অমনি তোমায় ওরা ঠ্যাঙাতে আরম্ভ করলে? বাজে ধাপ্পা। লোটনকে মেরোনি।

লোকটা আর কিছু বলে না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটা।

লোটন যাত্রা দেখায় মন দেয়।

কিছুক্ষণ আবার নাকটানার শব্দ। আবার ব্যাটাচ্ছেলে কাঁদচে! জ্বালালে।

পেত্যয় দাও বাবা। আমার ইস্তিরি আর বড় মেয়ে ওই চিকের আড়ালে রয়েচে। তাদের শুধিয়ে আসো আমি চোর কিনা। কি ভয় হয় জানো বাবা?

কি?—শুধোয় লোটন।

তিনচার দিন আটক করে রাখলে বাচ্চাগুলো খেতে পাবে নি।

কেন?

মাটি কেটে, কুয়োর কাজ করে খাই। রোজ না পেলে চলবে কি করে?

ওরা তোমায় ধরে পেঁদালে কেন?

বোধ হয় ছোট জাত বলে। ভদ্দর মানুষের মেয়ের গায়ে হাত দিইচি। চোর হয়ে গেচি।

ছোট জাত বলে! খচ করে কথাটা বেঁধে লোটনের মনে। ভদ্রলোকের মেয়ের গায়ে হাত দিয়ে অপরাধ হয়ে গেছে! তাই চোর!

কাপড় ময়লা, মুখে দাড়ি, ছোট জাত, তাই এত হেনস্তা!

গরম হয়ে ওঠে লোটনের কান দুটো। নাকের ডগাটা ঘামতে থাকে।

যাত্রাটা জমে উঠেছে। সকলের চোখ ওদিকে।

লোটন আস্তে আস্তে বাঁধনটা খুলতে থাকে লোকটার।

একি করছ? লোকটা অবাক।

লোটনের ঠোঁটদুটো কঠিন হয়ে ওঠে,—খুলে দোব। চুপচাপ ঘুপটি মেরে চলে যাও। গোল কোরনি একদম।

আলগা হয়ে আসে লোকটার বাঁধন। কেউ খেয়াল করে না।

লোকটা ব্যস্ত হয়ে বলে,—করছ কি। তোমাকে পুঁতে ফেইলবে টের পেলি।

ফেলুক, তুমি বেরোও, এখান থেকে এখ্খুনি।

যদি জানতি পারে?

তোমাকে কি জমিদারবাবুর লোক চেনে?

• হ্যাঁ। কাল যে আমায় বেঁধে নে আসবে গো।

তুমি যাও। তোমায় বেঁধে আনবে না।

লোকটা ঘাড় নীচু করে সরে পড়ে।

লোটন চুপ করে বসে থাকে।

হ্যাংলা, ক্যাংলা ওরা সবাই সামনে তাকিয়ে। কেউ টের পায় না।

কিছুক্ষণ পর যাত্রার একটি বড় অঙ্ক শেষ হয়। সবাই তাকায় চারদিকে। পানবিড়ির দোকানে ভিড় বাড়ে। ভাঙা কাপে চা আসে বারোয়ারী থেকে। জমিদারের লাল জল নিয়ে আসে পেয়াদা। কনসার্ট শুরু হয়। ঢোলকের আওয়াজে, কাঁচাঘুমভাঙা চীৎকারে, ও পটলা ও বুঁচী নানা ধরনের ডাকে এক হট্টগোলের সৃষ্টি হয়।

অনেকেরই নজরে পড়েনি, কিন্তু দুচারজনের নজরে পড়ে যায় যে বাঁধা চোরটা পালিয়েছে।

ওরে হাওয়া কেটেছে শালা চোর।

কোথা গেল বল তো? কোন ফাঁকে কাটল?

শালা রামঘুঘু!

নানা মন্তব্যে ভরে ওঠে আসর।

জমিদারমশায়ের কানে যায়। রাঙা স্তিমিত চোখ দুটো ফাঁক হয়। কোথায় গেল? বাঁধন খুললে কি করে?

লোটন সোজা জমিদারমশায়ের সামনে এসে বলে সটান,—আমি খুলে দিইচি ওকে।

ব্রহ্মতালু বরাবর বাজ পড়লেও বোধ হয় লোক অত কেঁপে উঠত না। লোটনের কথায় শিউরে উঠল সবাই। বলে কি ছেলেটা! এখুনি যে আছড়ে মেরে ফেলবে।

হ্যাংলা ক্যাংলা হারান উঠে দাঁড়ায়। লোটনা কি খেপে গেল?

চিকের আড়ালে লোটনের মা ভিমরী খেয়ে শুয়ে পড়বার মতো হল। লোটনের কাকী মা দুর্গা নাম জপ শুরু করলে।

সুধন্য হালুইকর হাসবে কি কাঁদবে ভেবে না পেয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

জমিদারের নেশার আমেজ কেটে গেল বোধহয় ছোঁড়াটার স্পর্ধায়।

কে তুই?

আমি লোটন।

কে একজন বলে দেয়, সুধন্য হালুইকরের ভাইপো।

বলীধর!—ডাকে জমিদার।

বিরাট চেহারার বলীধর জমিদারের বডিগার্ডের মতো।

হুজুর।—বলে হাজির বলীধর।

ছোঁড়াটাকে নীচের খুপরিতে আটকে রাখো।

বলীধর টানতে টানতে নিয়ে যায় লোটনকে। কেউই কিন্তু লক্ষ্য করে না যে লোটনের ইসারায় হ্যাংলা আর ক্যাংলা সকলের অলক্ষ্যে বলীধর আর লোটনকে অনুসরণ করে।

আসর ছাড়িয়ে অন্ধকার মাঠ পেরিয়ে বলীধর নিয়ে যায় লোটনকে। ডানদিকে শিবমন্দির আর বাজার ফেলে এগোয়—পিছনে এগোয় হ্যাংলা ক্যাংলা। বাজারের দোকান ঘরগুলোর বারান্দায় দু' একটা আলোর রেশ চোখে পড়ে! শরতের কুয়াশায় আবছা আলোতে কিছুই দেখা যায় না।

এইবার বাঁ পাশে জমিদারপ্রাসাদের শেষপ্রান্ত। থামে বলীধর। একটা ছোট খুপরির মতো ঘর খোলে। ভেতরে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় লোটনকে। তারপর চারদিকে তাকায় কেউ এধার ওধার আছে কি না। দরজা বন্ধ করে শিকল তুলে দেয় বাইরে থেকে। নেমে আসে বারান্দা থেকে। কিছুক্ষণ দাঁড়ায়, আবার তাকায় চারদিকে। হ্যাংলারা ততক্ষণে লুকিয়ে পড়েছে একটা দোকানঘরের আড়ালে।

বলীধর এবার নিশ্চিন্তমনে চলে যাত্রার আসরের দিকে। কে জানে এতক্ষণে নাচগান কটা শেষ হয়ে গেল কিনা!

বলীধর দূরে চলে যেতেই হ্যাংলারা এগিয়ে আসে। ক্যাংলা বলে,—কোন ঘরটা রে?

" হ্যাংলা একটা ঘরের দিকে দেখায়,—এইটে।

কোন ঘরে যে লোটনকে পুরে রেখে গেল ঠিক করতে পারে না।

ঘরের দোরে আস্তে ধাক্কা মারতেই দরজাটা খুলে যায়। ভেতর থেকে এক বুড়ীর গলা—কেরে মুখপোড়া এত রেতে ?

ওরা টুপ করে বসে পড়ে বারান্দার তলায় ঘাসের ওপর। বোধ হয় বলীধরের বুড়ো মা থাকে এ ঘরে।

ক্যাংলাকে খেঁকিয়ে ওঠে হ্যাংলা,—এখুনি দফা গয়া হয়েছিলো আর কি! তোর জন্যি!

আমি কি করলুম ?

আস্তে, চুপ!

বুড়ী আলো হাতে বাইরে বেরিয়েছে।

আবার ঘরে ঢোকে।

ওরা এবার বারান্দায় উঠে পাশের ঘরের দোর ঠেলে। দোর বন্ধ।

হাত বাড়িয়ে শেকলটা নাগাল পায় পায়ের গোঁড়ালি উঁচিয়ে।

লোটনা!—ফিসফিস করে ডাকে ক্যাংলা।

হ্যাংলা ওর মাথায় খটাং করে একটি জবর গাঁট্টা বসায়। অর্থাৎ চুপ বোকা।

শেকলটা খুলে ফেলে হ্যাংলা।

ভেতর থেকে লোটন বেরিয়ে আসে,—কে হ্যাংলা ?

হ্যাঁ।

তোরা এবার চলে যা। শুধু আমার মাকে গিয়ে বলবি, লোটনা ঘোষালবাড়ির পগারের ধারে বাঁশঝোপে আছে। কাউকে বলবিনি যেন এ কথা। —আর শোন, কাল সকালে তোরা হোথাকে একবার যাবি। জানিস্!

হ্যাংলা মাথা নেড়ে বলে,—কিন্তু যদি কেউ দেখে ফেলে।

লুকে যাবি।

আজ রেতে থাকবে কোথা।

ইস্কুল-বাড়িতে।—বলে লোটন।

ক্যাংলা ফিসফিস করে বলে ওঠে,—ওরে বাপ্! ইস্কুলবাড়িতে তো রাত্তিরে পাটকেল পড়ে দমাদম্। ও তো ভূতের আড্ডাখানা।

হ্যাংলা আর একটা গাট্টা বসায় ক্যাংলার তালুতে,—গাধা!

ক্যাংলা এবার আর সয় না,—মারলে যে বড়।

লোটন ক্যাংলার হাতখানা ধরে মোচড়ায়,—হাড় ভেঙে দোব চেঁচালে।

হ্যাংলা সমর্থন করে।

চলে যায় ওরা।

লোটন একা একা গভীর অন্ধকারে ইস্কুলবাড়ির দিকে রওনা হয়। জমিদার প্রাসাদের সীমানার প্রাচীর ছাড়িয়ে চলে যায়। স্টেশনের সড়ক ধরে এগোতে থাকে। একটা মানুষের সাড়া নেই কোনদিকে। গভীর নীল আকাশের তলায় দু পাশে ধূ ধূ মাঠের মাঝখানে লোটনের বড় একা একা লাগে। দু দিকে তাকায়। তাকায় ওপরে আকাশের দিকে। পঞ্চমীর ছোট চাঁদ উঠেছে সবে মাঝহাটার বনের সীমানার ওপরে। শরতের শিশিরে আলো দেখা যায় না ভাল করে। বেশ অন্ধকারই মনে হয়। রাত অনেক হবে।

আরও আধ ক্রোশ গেলে তবে ইস্কুলবাড়ি। একটা নালার সামনে এসে পড়ে লোটন। নালাটার ওপারে শ্মশান। ডানদিকে নালাটা ক্রমশ বড় হয়ে একটা বিরাট দ' হয়ে উঠেছে। এখানে নাকি ঘূর্ণী আছে, ঘূর্ণীর তলায় জলের গভীরে নাকি দেবতারা বাস করে। তার ওপর দিয়ে তাকে অমান্য করে কেউ যেতে চাইলে ঘূর্ণীতে ফেলে তাকে তলায় টেনে নেয়। বড় বড় নৌকোকে ডুবার পাক ঘুরিয়ে খড়কে কাঠির মতো সোজা খাড়া করে তলায় টেনে নেয় সবশুদ্ধু।

লোটন থমকে দাঁড়ায় নালার সামনে। নালাটা পার হতেই হবে। নালার ওপারে শ্মশান পেরিয়ে আরও এগোলে তবে ইস্কুলবাড়ি।

দাঁড়িয়ে ভাবে লোটন। কি করবে ও।

ইস্কুলবাড়িই কি যাবে? ক্যাংলার কথাটা খুব মিথ্যে নয়। বহুকাল থেকে তারাও শুনে আসছে ইস্কুলবাড়িতে রাতে ভূতেদের তামাক খাবার গল্প করবার আড্ডা বসে।

কে জানে যদি সত্যি হয়।

গাটা ছমছম করে ওঠে লোটনের। একটা দমকা বাতাস ওর কানের পাশ দিয়ে শোঁ শোঁ শব্দ করে বেরিয়ে যায়। হঠাৎ বাতাসটা এলো কোথা থেকে?

ঝুপ করে একটা শব্দে চমকে তাকায় লোটন। কি একটা যেন পড়ল দ'য়ের পাড় থেকে জলের ভেতর।

জলের বুড়বুড়ি ওঠে। বুগ্—বুগ্—বুগ্—শব্দ হয় জলের।

তবু দাঁড়িয়ে থাকে লোটন। গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

রামনাম জপ করতে করতে সেই দিকে এগোয় লোটন। দেখাই যাক ব্যাপারটা কি।

ঠিক সেই জায়গায় এসে ভাল করে দেখে পাড়ের খানিকটা মাটি ভেঙে পড়েছে জলে।

মনে ওর আবার সাহস ফিরে আসে।

নালাটার এপাশে এসে জলে নামে। এখানে হাঁটুজল। প্রায় মাঝামাঝি এসে কি একটা পায়ে বেধে যায়। দাঁড়িয়ে পড়ে ও।

পা দিয়ে ঠেলে। একটা ভাঙা মাটির কলসী।

এগিয়ে নালাটা পার হয়ে ওপারে ওঠে।

দুদিকে শ্মশান। মাঝ দিয়ে রাস্তা।

ওপরে কালো আকাশ। দু একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্রের পাশে একটুখানি আবছা চাঁদ। মেঘ নেই, গতি নেই? শুধু শূন্য। লোটন তাকায় আকাশের দিকে। জীবনের গভীরতম কোটরের একটা দরজা যেন ওর সামনে আজ খুলে যায়। সেখানে শুধু নাই—নাই—কিছুই নজরে পড়ে না। কিছু আটকায় না অন্তরের দৃষ্টির গতিকে। যতদূর যাও, শুধু বোধাতীত আনন্দ। দমটা যেন বন্ধ হয়ে আসে লোটনের। বুকটা ভরে ওঠে যেন ওই বিরাট আকাশের সবটুকু নিয়ে। সব ভুল হয়ে যায় লোটনের! ও কবে ছিল, কবে আছে, কোথায় আছে, কোথায় থাকবে কিছু মনে নেই। মনে না থাকার গভীর আরামে তাকিয়ে থেকেও যেন লোটনের মনে হল ও চোখ বুজে আছে।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র।

অকস্মাৎ পায়ের কাছে একটা স্পর্শে সম্বিত ফিরে এলো ওর।

পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখে একটা কুকুরছানা ওর পায়ের কাছে এসে কি শুঁকছে। চোখের সামনে কতকগুলো ভাঙা হাঁড়ি পোড়া কাঠ দেখে। কুকুর ছানাটা কেঁউ কেঁউ করে ওর পায়ের কাছে ঘুরতে থাকে! তবু ওর ভয় করে না। কিছুক্ষণের ভেতরই ওর সবটুকু ভয় যেন কে মুছে দিয়ে গেছে মন থেকে। এক সীমাহীনের আভাসে ওর ভেতরটা তখন পূর্ণ। মাটি গাছপালা শ্মশান এগুলোকে এতই ক্ষুদ্র মনে হল তখন ওর যে ভয় করবার মতো কিছুই আর পেল না।

কুকুরছানাটাকে হাতে তুলতে গেল। কুকুরছানা হাতে উঠল না। যেন কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে চলল। লোটনও চলল ওর পেছন পেছন। শ্মশানের সামনেটা ছাড়িয়ে মহাশ্মশানের ভেতরে গিয়ে পড়ছে ক্রমশ। তবুও লোটন চলেছে। ভারী মজা লাগছে ওর। বাচ্চাটা কোথায় যায় দেখতে ওর ভারি কৌতূহল—অকারণ কৌতুক যেন। অন্ধকারে চলল ওই কুকুরছানাটাকে অনুসরণ করে। ছানাটাও একবার ওর দিকে তাকায় আর কেঁউ কেঁউ করতে করতে এগোয়। অনেক দূর চলে এল।

একবার নীচের দিকে তাকিয়ে দেখে ছেঁড়া মাদুর বাঁশ আর ভাঙা মালসা ছড়ানো এখানে ওখানে। শ্মশানের এত দূরে তো লোটন কখনও আসে নি। আরও কিছুটা এগোয়, কুকুরটাও এগোয়। একটা দুর্গন্ধ নাকে আসে। পায়ে কি একটা আটকে গেছে। তাকিয়ে আবছা দেখা যায় একটা কাপড়ে বাঁধা মড়া। বোধ হয় পোড়াতে না পেরে ফেলে দিয়ে গেছে। মনে মনে হাসি পায় লোটনের।

ওটাকে ডিঙিয়ে এগিয়ে যেতে গিয়ে কুকুরটাকে আর দেখতে পায় না। একটু অবাক হয় লোটন। কুকুরের বাচ্চাটা কোথায়?

অকস্মাৎ মনে হয় ওর ও কোথায় এসে পড়েছে নিজেই জানে না।

সেখানে বসে পড়ে লোটন দু হাঁটুর ভেতরে মুখ গুঁজে।

কি একটা ভীষণ আশঙ্কায় ওর মন ভরে ওঠে।

পথ হারিয়ে ফেলেছে লোটন।

লোটন হারিয়ে যেতে বসেছে।

গভীর হতাশায় ওর মনে পড়ে অকস্মাৎ বুড়ো শিবের কথা।

বুড়ো শিবও তো এমনি একা একা থাকে। তার তো ভয় করে না। বুড়ো শিবের কথা ভাবতে ভাবতে ওর আর জ্ঞান থাকে না। সেখানেই শুয়ে পড়ে।

ভোরের আলো দূর বনরেখার ওপরে দেখা যায়। দু-চারটে কাকের ডাক শোনা যায় শ্মশানের আশেপাশে। কুকুর কয়েকটা ঝগড়া শুরু করেছে পাশেই, কানে আসে লোটনের। ওর জ্ঞান ফিরে আসে। চোখ দুটো কচলে তাকায় লোটন। ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে নিজেই বিস্মিত হয়। আবছা-আবছা মনে পড়ে কালকের কথা।

উঠে দেখে ভোর হতে দেরি নেই। মনে পড়ে জমিদারবাড়ির কথা। মানুষ জাগার আগেই ওকে ঘোষালবাড়ির পিছনে বাঁশঝোপের ভেতর যেতে হবে। শ্মশানের অনেক ভেতরে চলে এসেছে। রাস্তাটা কোনদিকে বুঝতে পারে না লোটন। তবু উঠে সামনের দিকেই হাঁটতে থাকে।

কিছুদূর এসেই দেখে কালকের সেই কুকুরের বাচ্চাটা পড়ে আছে। শীর্ণ কাতর বাচ্চাটা হয়তো বা মরেই গেছে। প্রায় দৌড়োতে থাকে লোটন। মানুষ জাগলে জমিদারবাড়ির লোক ওকে দেখতে পেলে আর রক্ষে নেই।

দৌড়োতে দৌড়োতে একটা খালের ধারে চলে আসে। এবার চিনতে পারে এটা বড় সোনাভূতির খাল। খালের ধার ধরে প্রায় ক্রোশখানেক গেলে তবে ওদের গাঁ।

বহুক্ষণ দৌড়োবার পর গাঁয়ের কাছাকাছি পৌছয় লোটন। ক্ষেতের ভেতর দিয়ে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে ঘোষালদের বাড়ির পেছনে বাঁশঝোপে যখন ও পৌছয় তখন রোদ এসে গেছে গাছের ডগায়। লোটন ঝোপের ভেতর ঢুকে দেখে সেখানে ক্যাংলা হ্যাংলা এসে হাজির আগে থেকেই। লোটনকে দেখে ফিসফিস করে বলে,—কোথা, ছিলিরে? ইস্কুলবাড়ি ঘুরে এলুম আমরা তোকে দেখলুম না।

লোটন ও কথার উত্তর দেয় না। বলে,—শোন, জায়গাটা পরিষ্কার করে বাঁশপাতার গদী করে ফ্যাল। একটু জিরোই। তারপর সব বলব।

হ্যাংলারা ঝোপের ঠিক মাঝে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে ফেলে। তারপর কাঁচা নরম বাঁশপাতা স্তূপাকার করে গদীর মতো করে তার ওপর খানকয়েক কলাপাতা জোগাড় করে এনে পেতে দেয়।

লোটন বসে ওর ওপরে।

বড় খিদে পেয়েছে রে?

কি খাবি?—শুধোয় হ্যাংলা।

যা পাস কিছু নিয়ে আয় না। এই প্যায়রা, শশা, কলা যা কিছু। যা না ঘোষালদের সামনের বাগানে ঢুকে পড় না দুগ্‌গা বলে। বোধহয় এখনও বাগানের দিকে যায় নি কেউ।

হ্যাংলা ক্যাংলা চলে যায়।

লোটন ওর ছোট কাপড়ের আঁচলখানা পেতে চিত হয়ে শুয়ে পড়ে।

হ্যাংলা কোঁচড়ে কিছু শশা নিয়ে আসে।

বলে,—নে খা।

শশাগুলো নিয়ে একটায় কামড় দিয়ে বলে লোটন,—বাড়ি গিয়ে আমার মাকে বলবি রাত্তিরে যাব হোথা। যেন জেগে থাকে।

হ্যাংলা নিঃশব্দে চলে যায়।

জমিদারমশাই রেগে আগুন। হুকুম দেয় নায়েবকে—এক ফোঁটা ছোঁড়ার এত বড় স্পর্ধা! যেখান থেকে পারো ধরে নিয়ে আসতে হবে। ওকে মাথা ন্যাড়া করে ঘোল ঢেলে গাঁ থেকে বার করে দেয়া হবে।

সুধন্য আছ হে!—মুখে একটু দোক্তা ফেলে ডাকে পেয়াদা।

সুধন্য ছিল না। দোরের পাশ থেকে বলে গোলাপবালা,—ঘরে নেই।

টুলুকে সামনে যেতে দেয় না। কে জানে জমিদারের লোক যদি ধরে নিয়ে যায়।

টুলু এগোতে চায় তবু। চুল ধরে টানে গোলাপবালা—দাঁড়া মুখপোড়া। ধরে নে যাবে যে।

কচু। তুমি ছাড় না।

• গোলাপবালা ধরে থাকে টুলুকে।

বলে পেয়াদা,—নায়েবমশায়ের হুকুম—একবার যেতে হবে কাছারিতে সুধন্যকে। অতি অবিশ্যি। আজই।

পেয়াদা চলে যায়।

উঠোনে এসে গোলাপবালা টুলুর গালে অকস্মাৎ কসে কয়েকটা চড় লাগায়,—মরেও না! মরণের দোরে চাবি দিয়ে এয়েচে সব! গুষ্টিকে দেখলে গা জ্বলে যায়।

লোটনের মা কামিনী ছিল রান্নাঘরে। রান্না করছিল আর আঁচলে চোখ মুছছিল মাঝে মাঝে। শুধোলে,—কি বলে গেল প্যায়াদা?

তোমার মাথা আর মুণ্ড! ছেলেটাকে তো খেয়েচো। এখন দেওরকে নিয়ে টানাটানি। যেমন তোমার কপাল তেমনি সব যোগাযোগ! ভাতার খেলে, পুত খেলে, এখন সবশুদ্ধ খাও।

কামিনী নীরব।

আক্কেলকেও বলিহারি যাই, ছোঁড়াটা কাল থেকে নিখোঁজ, একবার কাঁদলে নি গা! মা নয় রাক্কুসী। পেটে ধরলেই কি মা হয়!

কামিনীবালা চুপ করেই থাকে। কথা বললেই কথা বাড়বে। তাছাড়া ওর কথা বলবার শক্তিও ছিল না। হাতপাগুলো ঝিমঝিম করে অবশ হয়ে আসে। মাথাটা টলে। তবু মনোযোগ দেবার চেষ্টা করে উনুনের তরকারির ওপর।

ইতিমধ্যে আসে হ্যাংলা,—খুড়ীমা আছ?

কে?—গোলাপবালা এগোয়।

হ্যাংলা শুধোয়,—মেজখুড়ী কই?

কে?—গোলাপবালা সুর নরম করে বলে,—শোন তো বাবা। লোটন কোথা জানিস?

হ্যাংলা মুচকে হাসে।

বল না বাপ। চারটে মোয়া দোব।

ঠিক দেবে?

সত্যি দোব।

হ্যাংলা ফিসফিস করে বলে,—ঘোষালবাড়ির পেছনে বাঁশবাগানে লুকে আছে। দাও মোয়া দাও।

রাত্তিরে উপোস গেছে তো? রেতে কোথা ছিল?

অত জানি না। বোধহয় খায় নি কিছু। দাও মোয়া দাও?

আয় ভেতরে আয়।—গোলাপবালা ভেতরে গিয়ে হ্যাংলার কোঁচড়ে আট-দশটা মোয়া, কতকগুলো সন্দেশ আর নাড়ু দিয়ে বলে,—যা বাবা, লোটনকে দিয়ে আয়। খিদেয় ভিরমি খাবে নইলে। ভররাত উপোস গেছে!

হ্যাংলা বলে,—বারে, আমার?

এগুলো দিয়ে আয়। তারপর দোব।

আমি পারব না।

গোলাপবালা হ্যাংলার হাত দুখানা ধরে,—যা বাবা, তোর হাত ধরে বলছি। কাল ভররাত আমার ঘুম হয়নি। বাছা কোথায় পড়ে ছিল, কি খেল এই ভাবনায় রাত গেছে। যা লক্ষি বাবা আমার!

গোলাপবালার চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে। সে লক্ষ্য করে না কামিনী দোরের পাশ থেকে সব শুনছে, সব দেখছে।

আর শোন হ্যাংলা। তোর খুড়ো শুধোলে কোথায় আছে কিছু বলিসনি যেন। তবে বিপদ হবে।

আচ্ছা, বলে হ্যাংলা চলে যায় ঘর থেকে।

গোলাপবালা আঁচলে চোখ মুছে বাইরে আসে। এসেই দেখে, দোরের পাশে কামিনী দাঁড়িয়ে আছে।

একগাল হেসে বলে গোলাপবালা কামিনীর কানের কাছে,—জানো দিদি লোটন ঘোষালদের বাঁশবাগানে লুকে আছে।

কে বলবে যে এই গোলাপবালাই একটু আগে কামিনীকে ঝেড়ে কাপড় পরাচ্ছিল।

গোলাপবালার ভেতরের মানুষটিকে কামিনী চেনে।

ওর গলাটা জড়িয়ে কেঁদে ফেলে কামিনী। গোলাপবালার কাঁধটা চোখের

জলে ভেসে যায়। গোলাপবালাও কাঁদতে থাকে, বলে,—অত কেঁদোনি দিদি, আমারও কান্না পায়। কেঁদোনি। ছেলের অমঙ্গল হবে।

কামিনী মুখ তুলে চোখের জল মুছে রান্নাঘরে চলে যায় আবার!

গোলাপবালা টুলুর জলখাবার নিয়ে যায় পড়বার ঘরে টুলুর কাছে।

টুলুকে জলখাবার দিয়ে ঘরে আসতেই সুধন্য এসে হাজির।

হ্যাগো, বাবুদের বাড়ির প্যায়দা এয়েছেল?

গোলাপবালা চাল তুলতে তুলতে ঘাড় ফিরিয়ে বলে,—হুঁ। তুমি কোত্থেকে শুনলে?

দোকানে বসেছিনু। বললে পাঁচুকাকা, দেখোগা যাও প্যায়দা হাজির।

জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে বলে সুধন্য।

এয়েছেল। বলিচি বাড়ি নেই, তা শুনে বললে আজই হাজরে দিতে হবে নায়েবমশায়ের কাছে।

ভয়ে কাঠ হয়ে যায় সুধন্য, —নায়েবমশায়ের কাছে। ওরে বাপ!

তারপর চটে গিয়ে বলতে থাকে,—যত নষ্টের গোড়া ওই লোটনা ছোঁড়াটা। আমায় ডুবিয়ে ছাড়বে। বসে বসে মায়েপোয়ে খাচ্ছে, রক্ত শুষচে। জমিদারের মার খাইয়ে ছাড়বে আমায়। আগে জানলে কোন শালা দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষত। বলতে বলতে ঘর থেকে বেরোতে যায় সুধন্য।

গোলাপবালা শুধোয়—যাচ্ছ কোথায়?

নায়েববাবুর কাছে।

যেয়োখন। বসে জিরোও একটুকুন।

থাক আর জিরোতে হবে নি। এমনিই তো মেরে ফেলচে সবাই মিলে।

গোলাপবালাও চটে,—মিছিমিছি ছেলেটাকে বকছ কেন। একে ছেলেটার কাল রাত থেকে কোন খোঁজ নেইকো।

চুলোয় যাক্। মরুক।

ও মরলে তোমার ছেলেও মরুক। শুধু শুধু অতবড় ছেলেটাকে মরাচ্ছে। হায়াও নেই গা। নিজে তো বুড়ো মদ্দ হয়ে জমিদারবাবুকে বলে ওকে ছাড়াবার

ব্যবস্থা করতে পারলে নি, আবার মুখ নাড়চে। যাও, নায়েববাবুর হাতেপায়ে ধরে ওকে বাড়ি আনবার ব্যবস্থা করে এসো।

বড় যে দরদ দেখচি। বলে সুধন্য।

দরদ তো তোমারই হওয়া কত্তব্য। ভাইপো তো বটে! লোকে যে গয়ের ছুঁড়ে দেবে!

সুধন্য বকবক করতে থাকে,—ঘরেবাইরে সব জায়গায় অশান্তি। আমায় মেরেই ফেলবে দেখচি। বলতে বলতে বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে।

গোলাপবালা ঘরের কাজ গোছাতে থাকে।

ঠিক দুপুরে সুধন্য ঘেমে এসে হাজির।

বলে;—আমি গেচি! ঠিক যা বলেচি তাই।

গোলাপ টেরিয়ে তাকিয়ে বলে,—হল কি যে অমন করচ।

কামিনী ছুটে এসে দোরের সামনে দাঁড়ায়।

ছোঁড়াটা আমার সব্বনাশ করে গেছে।

কি সব্বনাশ করলে আবার?

বাবুদের বাড়ি থেকে কোথা পালিয়েচে কেউ জানে না।

তাই নাকি। সে কি গো!—সব জেনেশুনেও অবাক হয় গোলাপবালা।

বলে,—তা কি বললে ওরা?

সুধন্য হাঁপাতে হাঁপাতে বলে,—এক গেলাস জল দাও।

তা দিচ্ছি। কি বললে শুনি?

বলবে আবার কি, বললে তিনদিনের ভেতর হারামজাদাকে খুঁজে দিতে হবে।

গোলাপবালা শুধোয়,—না পারলে?

চুপ্‌ চোপ্‌। আগে জল দে।

জল গড়িয়ে এনে দেয় কামিনীবালা।

জলের গেলাসটা ছুঁড়ে ফেলে সুধন্য,—ওর হাতের জল খাবনি।

কেন শুনি?—বলে গোলাপবালা,—ওর হাতে কি গন্দ আছে!

কামিনীবালা আবার দোরের আড়ালে সরে যায়।

• গোলাপবালা জল এনে দেয়।

জল খেয়ে একটু সুস্থ হয় সুধন্য।

যদি খুঁজে না দিতে পারো? তবে কি হবে? যেন ভয়ে ভয়ে শুধোয় গোলাপবালা।

সুধন্যর চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে। ভয়ে ভয়ে বলে,—কি আবার হবে। আমায় কয়েদ করে রাখবে। তোমার তো পোষ মাস। আমার বেম্মতালু জ্বলছে—আর তুমি মজা দেখচ!

সেকিগো, একজনের অপ্‌রাদে আর একজন কয়েদ!

তবে আর বলচি কি! আমি গেচি!

তা নায়েবমশায়ের হাতে পায়ে ধরলে নি কেন? যদি মাপ করে দিত।

তা কি আর ধরিনি। নায়েবমশায়ের তো কোন হাত নেই। খোদ কত্তার হুকুম যে।

কত্তার কাছে গেলে পারতে একবার।

ওরে বাপরে। শেষকালে মরি আর কি!

অত যদি ভয়, তবে কয়েদ খাটগে। বিরক্ত হয়ে যেন বলে গোলাপবালা। সুধন্য একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করে থাকে।

গোলাপবালা ঘর থেকে বেরিয়ে যায় রান্নাঘরের দিকে।

ওলো ও গোলাপ, শোন একবার ইদিকপানে।—ডাকে কামিনী কুয়োর পাড় থেকে। ওই জায়গাটা বাড়ির ভেতর একটু আবডালে। কামিনীর ডাকে গোলাপবালা ফিরে তাকায়।

শোন।—ইশারায় ডাকে কামিনী।

কি বলো? বলে গোলাপবালা।

ওনাকে বললে তো পারতিস, লোটনা ঘোষালবাড়ির বাঁশবনে রয়েচে। হতভাগার দোষে ওকে মিছিমিছি কয়েদ করবে। এ কি ধম্মে সইবে।

আমার খুশি আমি বলিনি।

তাই বলে ঠাকুরপো আটক থাকবে!—কামিনী বলে।

গোলাপবালা চটে,—থাকবে। যে নিজের ভাইপোকে বাঁচাতে পারলেনি তাকে আটক রাখতেই হবে।

কামিনী বিস্মিত হয় গোলাপবালার কথায়। গোলাপের মনটা এমন কে জানত। বরাবরই গোলাপ মুখরা। ওর কথাগুলো যেন বিষে ভেজা। সর্ব শরীর জ্বলে যায়। ব্যবহারও কামিনীর সঙ্গে কোনদিনই বড় একটা ভাল করেনি। নানাভাবে নির্যাতন করবার সুযোগ পেলে ছেড়ে দেবার কোন সদিচ্ছাই কখনও ও গোলাপের ভেতর দেখেনি। শুধু এটুকু লক্ষ্য করেছে যে টুলু আর লোটনকে গোলাপ কখনও আলাদা বলে ভাবেনি। আলাদা রকম খাওয়ায়নি পরায়নি। টুলুর জামা এলে লোটনের জামা এসেছে। কি করে যে এসেছে সেকথা কামিনী ভাল জানে না। তবে এইটুকু বুঝেছে যে সুধন্যর ইচ্ছা না থাকলেও গোলাপের কথায় তাকে কিনতে হয়েছে।

কিন্তু আজ গোলাপের ব্যবহারে কামিনী যতটা বিস্মিত না হয়েছে তার চেয়ে বেশি আনন্দ পেয়েছে। এক অভূতপুর্ব আনন্দে ওর লোটনের জন্যে দুশ্চিন্তার ভারও যেন লাঘব হয়ে গেছে। ওর মনের অবচেতনে এক বিরাট ভরসা দেখা দিয়েছে আজ যে সে মরে গেলেও লোটনের আর একজন আপন মানুষ সংসারে থাকবে—সে গোলাপ। এর চেয়ে বড় ভরসা আর কামিনীর কি থাকতে পারে।

লোটন যে গোলাপের কাছে নিজের স্বামীপুত্রের চেয়ে একটু কম নয়—একথা এত পরিষ্কার করে কামিনী এর আগে কখনও জানত না।

তাই কামিনী আবার বলে।—না হয় আমিই বলি ঠাকুরপোকে।

ন্যাখো,—গোলাপ চটেছে।—অনেক আদিখ্যেতা দেখালে, অনেক ছেনালি দেখলুম। শেষকালে মা হয়ে ছেলেটাকে মেরে আর ডাইনী নাম কিনো নি। খামাকা আমায় চটিয়ো না।

বাবুদের বাড়ি কি লোটনকে মেরে ফেলবে ভাবছিস!—বলতে চায় কামিনী নরম হয়ে।

তবে তোমার দেওরকে মেরে ফেলবেনি, নিশ্চিন্ত থাকো। যাও রান্না করোগে।

আর কামিনী কি বলতে পারে!

গোলাপবালাও আর কিছু বলা প্রয়োজন মনে করে না।

দুদিন কেটে যায়। আজ তৃতীয় দিন! এই তিনদিনই লোটনকে বাঁশ বনের ভেতর কাটাতে হয়েছে। ভেতরটা পরিষ্কার করে দিয়েছে ক্যাংলা আর হ্যাংলা। কাঁথাও একখানা এনে দিয়েছে ওরা বাড়ি থেকে। খাবার নিয়ে আসছে নিয়মিত কাকিমার কাছ থেকে।

ঠিক লুকিয়ে আনতে পারিস তো? না কেউ দেখে ফেলেচে রে?—শুধোয় লোটন ক্যাংলাকে।

ক্যাংলা একগাল হাসে—কোন শালা দেখবে! দেখলে মেরে ময়দা করে দোব না।

হ্যাংলা একটা রাম গাঁট্টা মারে ক্যাংলার মাথায়,—বলিহারি বুদ্ধি! দেখলে তাকে ধরে মারবে! তবে তো আরও জেনে ফেলবে র‍্যা গাধা।

লোটন বলে,—খুব চোখ রেখে আসবি। কোথা দিয়ে কেউ দেখে না ফেলে। দেখলে কি বলবি?

বলব হাওয়া খেতে যাচ্ছি—বলে ক্যাংলা।

শুনলে বুদ্ধি! বাঁশবনে ও হাওয়া খেতে আসছে! পয়লা নম্বর গবেট!—

হ্যাংলা একটা চাঁটি মারবার আগেই ক্যাংলা টুক করে সরে যায়।

বলে লোটন,—বলবি মাছ ধরতে যাচ্ছি। এখানে সত্যিই যে আমি মাছ ধরতে আসতুম।

এরপর হ্যাংলারা চলে যায়।

লোটন বাঁশপাতাগুলো নিয়ে সাজায়।

আজ তিন দিন কেটে গেল। প্রথম দিন রাত্রে গিয়েছিল মায়ের সঙ্গে দেখা করতে।

রান্নাঘরের দোর খোলাই ছিল।

মা বলে ডাকতেই উঠে আসে মা—কে লোটন?

হ্যাঁ মা।

দোরটা বন্ধ করে ঘরের ল্যাম্পটা জ্বালায় কামিনী। লোটনের মুখখানা দেখবে,—তাই।

লোটনকে হাত ধরে টেনে কোলের কাছে নিয়ে কাঁদে কামিনী।

এই মরেচে! কাঁদচ কেন?

বলে কামিনী,—তোকে নিয়ে কি করি বলদিনি? কেন ওই চোরটাকে খুলে দিতে গেলি?

দোব নি খুলে? ও তো চোর নয়। ওকে ছোটলোক বলে চোর ভেবেচে।

ভাবুক, তা তোর কি?

বারে, আমার কি! কি যে বলো মা! আমাদের গাঁয়ে এমন একটা ইয়ে হয়ে যাবে আর—।

তুই কি গাঁয়ে মাতব্বর?—চোখ দিয়ে জল পড়তেই থাকে।

লোটন ওর মনের কথাটা ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারে না।

বলে,—যাক কেঁদোনি।

এখন কি করবি?

দিন কত আড়ালে থেকে আবার বাড়ি আসব।

তোর খুড়ো যদি ঢুকতে না দেয়?

না দেয় তখন দেখা যাবে।

যদি বাবুদের বাড়ি আবার টেনে নে যায়।

তখন ভুলে যাবে এরা। আমার কথা কি আর মনে করে বসে থাকবে? ওদের কত রাজ্যের কাজ।

কি জানি বাপু, তোর কথা বুঝতে পারি নে। যদি না ভোলে?

শেষ পর্যন্ত বলে লোটন, না ভোলে তো মার খাব কয়েক ঘা এই ত! কাকার মার খেয়ে খেয়ে অভ্যেস হয়ে গেছে। তুমি কিছু ভেবোনি। এবার যাই আমি।

কামিনী ছাড়তে চায় না ওকে।

কবে আসবি ঘরে?

দিন কতক যেতে দাও।

ওই বনের ভেতর সাপখোপ যদি কামড়ে দেয় ?

আরে দূর ! কত রাত্তির বসে বসে মাছ ধরেচি। কামড়ালেই হল !

ওদিকটা তো খুব জংলা ?

না না, সে সব সাফ করে নিয়েছি। কাঁথা মুড়ি দে আরাম করে ঘুমোব। যাই, তুমি শোও। তুমি কিছু ভেবো নি। আমাকে কোন শালা কিছু করতে পারবে নি।

চলে আসে লোটন কামিনীকে একা ফেলে। তারপর দুদিন আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

কি-ই বা হবে গিয়ে, কান্নাকাটি ভাল লাগে না লোটনের। অথচ মার জীবনটা তো কাঁদতে কাঁদতেই গেল। হাসতে মাকে দেখেনি কখনও লোটন। কে জানে বাবা যখন বেঁচে ছিল তখন হাসত কি না। তখন কি করত ভাবতেও পারে না লোটন। মা যে আবার কখনও শাড়ি পড়ত বা সিঁথিতে সিঁদুর দিত, হাসত, বেড়াত,—এ যেন ভাবাই যায় না। লোটনের কাছে কামিনী যেন বরাবরই এক বিষাদের প্রতিমূর্তি। ওই জন্তেই লোটনের আরও ভাল লাগে না বাড়ি থাকতে। ইচ্ছে করেই ও বাইরে বাইরে কাটায় বেশি সময়। বাড়ি থাকলেই কাকিমার গালি-গালাজ। প্রত্যুত্তরে মা নীরব। গালাগালির মাত্রাটা ছাড়িয়ে গেলে বড় জোর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। অসহ্য লাগে। তখন মনে হয় মাকে নিয়ে এই মুহূর্তেই বেরিয়ে যায় এ বাড়ি থেকে। তবু চুপ করেই থাকতে হয় লোটনকে। সহ্য করতে হয়। জন্মের থেকেই ওর যেন শেখা আছে সহ্য করতে হয় কিভাবে। সইবার এক বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে বুঝিবা জন্মেছে লোটন। নইলে হ্যাংলার মা আছে, হারানের মা আছে, তারা সব আর-এক রকমের আর লোটনের মাই বা আর-এক রকম হবে কেন ? অল্প বয়সে হলেও লোটন এগুলো আজ পরিষ্কার বোঝে।

বুড়ো শিবটার কাছে গিয়ে ও মাঝে মাঝে ওর মনের সব কথা বলে। তখন যেন সত্যি মনে হয় একটা মস্ত বোঝা নেমে গেল ওর বুক থেকে। বুকটা যেন

হালকা হালকা লাগে। শরীরটা অনেক হালকা মনে হয়। হাতপাগুলো আর ভারী হয়ে টেনে আসে না, ভাল করে হাতপা ছুঁড়তে পারে ও।

আজ রাত্তিরে যাবে লোটন বুড়োশিবের মন্দিরে।

কয়েকদিন একা একা থেকে বড়ই খারাপ লাগছে লোটনের। সর্বশরীর যেন বোঝা হয়ে আসছে। কেন তা কি ও বুঝতে পারে! চেষ্টা করলেও পারে না যে অনেক দুশ্চিন্তায় শরীরটার এমন অবস্থা মাঝে মাঝে হয়।

আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকিয়ে যাবে বুড়োশিবতলায়। গিয়ে বলবে বুড়ো শিবকে যে ও কি যাত্রার রাত্রে লোকটাকে খুলে অন্যায় করেছে? যদি অন্যায় না করে থাকে তবে কেন তার এমন অবস্থা। তবে কেন বাবুদের বাড়ি তাকে আটকে রাখতে চাইছে ওরা।

দিনটা ভাবতে ভাবতে কেটে যায় লোটনের।

সন্ধ্যাও যায়। রাত্রির অন্ধকারে সত্যিই যায় লোটন বুড়োশিবের ভাঙা মন্দিরে

মন্দিরের দরজা নেই। আলকাতরার মতো ঘন অন্ধকার।

ঘরে ঢুকতেই কয়েকটা চামচিকে উড়ে পালায়। লোটন ভয় পায় না। লোটন জানে যে চামচিকের বাসা আছে মন্দিরে। ঘরে ঢুকেও ও এদিক ওদিক করে না। সোজা পাথরের শিবটিকে গিয়ে জড়িয়ে ধরে।

ঠাণ্ডা পাথরের স্পর্শে ওর দেহের সবটুকু তাপ যেন শীতল হয়ে যায়।

পাথরটার গায়ে গা রেখে ও পাথরটাকে নানাভাবে আদর করতে থাকে। নীরব পাথরটাই যেন একমাত্র ওর সবটুকু আদর অত্যাচার অভিযোগ নীরবে সয়ে যায়।

ওর ভারী আরাম লাগে,—বুড়োশিব। তুইও একা একা আছিস আমার মতো। তোকে দেখবার কেউ নেই। তোকে খেতে দেবার কেউ নেই। তুই তো খেতে চাস না কারো কাছে। বছরে একবার চড়কের মেলায় ভর পেট খেয়ে বছর ধরে উপোস। তোর কি খিদেও পায় নারে?

ছাখ মনে ভারী কষ্ট হয়েছে আমার—বলতে বলতে লোটনের ফুলো-ফুলো গাল বেয়ে টপটপ করে জল পড়তে থাকে।

তুই কি বুঝিস নি কি কিছু। সবাই তো বলে তুই সব জানিস, তুই ঠাকুর। কাঁচকলা বুঝিস।

এমনি কত অভিযোগ কত অভিমান সবই এক খণ্ড পাথরের বিরুদ্ধে। আর কাকেও যেন ওর কিছু বলবার নেই। শৈশব থেকে শুনে এসেছে ঠাকুর সব জানতে পায়, সব শুনতে পায়। অন্য ঠাকুরের মন্দিরেও ওর ঢোকবার হুকুম নেই। ওরা যে ছোট জাত। ঠাকুরের প্রতিমা ছুঁলে যে ঠাকুরের জাত যাবে।

তাই লোটন বেছে বেছে এই বনের ভাঙা বুড়োশিবের পাথরটাকে ওর ঠাকুর বলে মেনে নিয়েছে। একে তো ভদ্রসমাজ বাতিল করে দিয়েছে মন্দির ভাঙা বলে। তাই এই শিবটার বোধহয় আর জাত নেই। লোটনদের মতো ও এখন নোওরা গরীব ছোট জাত হয়ে গেছে। ভদ্র বড় মানুষরা ত আর কেউই আসে না।

লোটন ছাড়া বছরে আর কেউ মন্দিরটার ত্রিসীমানায় আসে কিনা সন্দেহ।

কারণটা সাপের ভয়। বড় বড় অজগরজাতীয় সাপ কয়েকটা দেখা গিয়েছিল মন্দিরের এপাশে ওপাশে বহু আগে।

লোটন সাপের ভয় করে না। ও তো শিবের মাথায় থাকে। শিব যদি তাকে ভালবাসে তবে সাপেও তাকে ভালবাসে—এই বিশ্বাস লোটনের।

অনেক রাত আজ বুড়োশিবের মন্দিরে কেটে যায়। গভীর রাত্রে সকলের অজ্ঞাতে গোপনে বাঁশবনে চলে আসে লোটন। আকাশের তারা ছাড়া সে অভিসারের আর কেউ সাক্ষী থাকে না। গাঢ় অন্ধকারে চলে আসে লোটন। ভয় আর নেই লোটনের। ভয় মুছে গেছে—যেন সবটুকু ভয় ঝেড়ে ফেলে এসেছে ও পাষাণটার গায়ে। কাঁথাটা মুড়ি দিয়ে শুকনো বাঁশ-পাতার ওপর শুয়ে পড়ে লোটন। শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণের ভেতরই গাঢ় ঘুম এসে যায় ওর।

ঘুম যখন ভাঙে, তখন সূর্য পশ্চিমের ক্ষেতের সীমানায় অনেকটা ওপরে বটগাছের মাথায় উঠে গেছে। চোখ কচলে উঠে ও নিজেই অবাক, ওরে বাস্ এত বেলা হয়ে গেছে!

এখন তো আর পুকুরের ধারে গিয়ে হাতমুখ ধোয়া যাবে না। ভারী মুশকিলে

পড়ে যায় ও। বসে বসে ভাবতে থাকে কি করা যায়। শেষকালে ঠিক করে যে ঘাটের যেদিকটা কেউ যায় না, ঘন বেতের ঝোপে ভরা সেই দিক দিয়েই যেতে হবে লোটনকে। বেতঝোপের ভেতর অবশ্য বেজি আর পিঁপড়ের উৎপাত আছে। তা থাক। বড় জোর পায়ে কয়েকটা কামড় বসাবে বড় বড় পিঁপড়ে। বসাক।

লোটন উঠে দাঁড়াতে যাবে এমনি সময় হারান আর ক্যাংলা এসে হাজির।

সব গুবলেট হয়ে গেছে!—মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে হারান।

হ্যাংলা কোথা?—শুধোয় লোটন।

হারান বলে,—ওকে তো পাহারায় রেখে এসেছি। তোর খুড়োকে তো গর্দান ধরে টেনে নে গেছে কাচারিতে বাবুর সামনে।

তাই নাকি? কেন?

ক্যাংলা বলে ওঠে,—উঃ শালাকে যেন কুকুর-টানা করে টেনে নে গেল!

হারান ওর মাথায় চাঁটা বসায়,—অ্যাই, লোটনের খুড়োকে শ্যালা বলছিস!

কই শালা বলনু।

লোটন গম্ভীর হয়ে যায়। কুকুর-টানা করে নিয়ে গেল মানে মারতে মারতে নিয়ে গেল নাকি তাই বা কে জানে।

কেন ধরে নে গেল বল তো?

তোর জন্যি। বাবু বলে, তোর ভাইপোকে তুই লুকে রেখেচিস। হয় বার করে দে নয়তো তোকে কয়েদ করে মার দোব।

লোটনের মুখটা অকস্মাৎ রাঙা হয়ে ওঠে,—আমার জন্যি?

হ্যাঁ তবে না তো কি; তুই তো সবাইকে ডোবালি।—বলে ক্যাংলা।

চুপ মার,—হারান ধমকায়।

লোটন বলে—দেখে আয় তো, খুব মারছে কিনা।

হারান ক্যাংলা ছুটতে যায়।

লোটন আবার ডাকে—থাক। দেখতে হবে নি। আচ্ছা কখন নিয়ে গেচে বল তো?

• লোটন যেন অস্থির হয়ে গেছে। কিছুই স্থির করতে পারছে না। ও জানে কাকা কত ভীতু। বাবুদের বাড়ির নাম শুনলে চার বার করে পেন্নাম করে। চৌকিদার দেখলে দশ হাত দূর দিয়ে পালায়। একবার লোটনরা এক চৌকি-দারের পাগড়ি খুলে নিয়েছিল গাছে ওপর থেকে আঁকসি দিয়ে। চৌকিদারটি টের পেয়ে নালিশ করেছিল সুধন্য হালুকয়ের কাছে। সুধন্য ভয়ে কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারেনি। এত সাহস! ধারণার বাইরে সুধন্যর। লোটনকে খুনই করে ফেলবে ঠিক করেছিল। কিন্তু একবেলা লোটনের পাত্তা না পাওয়ার কিছুই করতে পারেনি। মায়ের কাছে শুনেছে লোটন, শেষকালে নাকি ভয়ে প্রায় কাঁদো কাঁদো। তাকে থানায় টেনে নিয়ে যাবে এই ভয়ে। চৌকিদারটি লোটনদের ভালভাবেই চিনত। পাগড়ি ফেরত দিয়ে লোটন যখন বাড়িতে আসে তখন চৌকিদারকে সঙ্গে নিয়েই আসে। চৌকিদার তার খুড়োকে হাসতে হাসতে মানা করে যায় লোটনকে মেরো না যেন। আশ্চর্য! চৌকিদারের হুকুম যেন দেবতার আদেশ। সুধন্য এতবড় অপরাধের পর একটা কথাও বললে না লোটনকে।

তাই ভাবছে এত ভীতু কাকা। শেষকালে বাবুদের বাড়ি গিয়ে হয়তো বা চিৎকার করে কাঁদতেই আরম্ভ করবে, কি ভিরমি খাবে, কি মরেই যাবে! লোটন ভাবিত হয়ে পড়ে।

চ আমি যাব।

তুই কোথা যাবি?—বলে হারান।

যাব বাবুদের বাড়ি। কাচারিতে নিয়ে গেছে ঠিক দেখেচিস তো?

তবে না তো কি তোর সঙ্গে খুড়োকে নিয়ে তামাসা করচি।

তবে চ।—লোটন উঠে পড়ে।

ক্যাংলা চেপে বসায়,—এরে! খেপে গেলি নাকি! মেরে ভূত করে দেবে যে তোকে।

ছাড়,—ধমকে ওঠে লোটন।

হারানও বলে,—তোকে পেলে যে মেরেই ফেলবে। বলীধরের বেঁটে লাঠির গুঁতো জানিস তো?

তা হোক। আমাকে যেতে হবে।

ক্যাংলা ভয়ে কাঠ হয়ে যায়,—এই মরেচে? আমি পালাই। লোটনার মার আমি দেখতে পারব নি।

ক্যাংলা পালিয়ে যায়।

হারানও বলে,—আমিও যাই ভাই।

মানে লোটনের সঙ্গে গেলে যদি এদেরও ধরে লাগায় ঘা কতক, এই ভয়।

হারানও চলে যায়।

লোটন একা দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে কি করবে। তার জন্য কাকাকে কয়েদ করবে, মারবে—এটা ও কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না। বুকের ভেতরটা ওর কেমন করে ওঠে। ওকে যেতেই হবে। বলীধরের মার সে খেতে রাজী আছে। যেতে ওকে হবেই। চোদ্দ বছরের লোটনের নরম ঠোঁট কঠিন হয়ে আসে। ওর চোয়ালদুটো শক্ত হয়ে আসে।

ধীরে ধীরে বাঁশবন ছেড়ে এগোয় লোটন। অনেকটা দূরে জমিদারপ্রাসাদ। একটু জোরে হাঁটতে থাকে। যতই কাকাব কথা মনে হয় ততই আরও জোরে হাঁটতে থাকে। একবার বাড়ি যাবার লোভ আর সামলাতে পারে না ও।

প্রথমেই বাড়ি গিয়ে ঢোকে।

কাকিমা!—

কাকিমাকেই প্রথম ডেকে ফেলে লোটন।

গোলাপবালা, কামিনী ওরা সবাই দাওয়ায় বসে ছিল।

কে? বলে এগিয়ে আসে ওরা। লোটনকে দেখে ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যায়।

কাকা কোথায় গেচে? শুধোয় লোটন।

গোলাপবালা ওকে জড়িয়ে ধরে টেনে নিয়ে আসে ঘরের ভেতর,—ভেতরে আয় হতভাগা। দেখতে পেলি মেরে ফেলবে।

টুলুও পেছনে পেছনে আসে।

লোটন আবার শুধোয়,—কাকা কোথায়?

বাবুদের বাড়ি ধরে নে গেছে,—বলে ওঠে টুলু।

টুলুর কানটা ধরে নেড়ে দেয় গোলাপবালা—চুপ কর।

ঘরের ভেতরে আসে গোলাপবালা।

কামিনী যেন অবাক হয়ে গেছে, একটা কথাও বলতে পারে না।

লোটন ঘর থেকে বেরোয়।

গোলাপবালা পিছন পিছন যায়,—কোথাকে যাচ্ছিস?

বাবুদের বাড়ি।—লোটন প্রায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে।

যাসনে। লোটন শোন বাবা, যাসনে। মেরে ফেলবানে তোকে। ও টুলু, শিগগির ধরে নে আয়।

গোলাপ দোরের কাছে চলে আসে ছুটে।

কামিনী নির্বাক। নড়বার শক্তি লোপ পেয়েছে কামিনীর।

টুলু তো হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

লোটন চলে যায়। দৌড়তে থাকে লোটন।

জমিদারপ্রাসাদের সামনে পৌঁছে দাঁড়ায় ও। কি একটু ভাবে—তারপর সোজা কাছারিঘরে হাজির হয়। দেখে, বাবু বসে আছেন ফরাসের ওপর।

বলীধর লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে দোরের পাশে। কয়েকজন প্রজা বসে আছে জলচৌকির ওপর। হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে সুধন্য।

বলীধর ওর কাঁধটা চেপে ধরে জোরে।

ওরে বাবারে! মরে গেলুম রে!—আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে সুধন্য।

চেঁচাবি তো গলা টিপে দেব।—ধমকায় বলীধর।

লোটন এসে বলীধরের হাতটা ধরে ঝাপটা মারে।

হাতটা সুধন্যর কাঁধ থেকে পড়ে যায়। ফিরে তাকায় বলীধর—আসামী হাজির।

ও খানিকটা অবাক হয়ে যায়। এত বছর চাকরি করছে কিন্তু এমন কাণ্ড দেখেনি ও কখনও। আসামী নিজে নিজে-এসে হাজির।

বাবু একটু নড়েচড়ে উঠে বসে—কে তুই?

আমি লোটন।

সুধন্য হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে,—এই যে বাবা এইচিস। ছাখ বাবা, আমায় ধরে নিয়ে এসেছে। আমি কিছু জানি নি। ধম্ম সাক্কি, আমি কিছু—।

তুমি বাড়ি যাও কাকা।

সুধন্য তৎক্ষণাৎ ঘুরে দরজা দিয়ে বেরোয়। কেউ কিছু বলে না।

সবাই-ই বোঝে যে ওকে আর দরকার নেই।

এতক্ষণে বলীধর লোটনের হাতখানা চেপে ধরে। ওর মুঠোর চাপে লোটনের হাতের হাড় পর্যন্ত টনটনিয়ে ওঠে।

চুপ করে সহ্য করে লোটন।

পালিয়েছিলি কেন?—শুধোন বাবু।

লোটন পরিষ্কার জবাব দেয়,—মারবেন বলে তাই।

ওর নিদারুণ সাহসে সকলের বিস্ময় চরমে ওঠে যেন।

এখন যদি মারি?

মারুন।—বলে লোটন।

জমিদার একটু কি ভেবে বলেন,—বল, সেদিন যাত্রায় চোরটাকে খুলে দিলি কেন?

ও চোর নয়।

আলবত চোর।—গর্জে ওঠেন বাবু।

না, ও চোর নয়।—আমি সব শুনেছি তাই বলছি।

চোপ, উল্লুক।—বাবুর রাজসিক বপুখানা দুলে ওঠে রাগে। গড়গড়ার নলটা পড়ে যায় হাত থেকে।

এতক্ষণে ফরাসের এককোণে একটি ফরসা পাতলা চেহারার লোক বসে ছিল। বয়েস তারও বাবুর মতোই। পঁয়তাল্লিশের মতো হবে। লোকটি এতক্ষণ একদৃষ্টে দেখছিল লোটনের দিকে।

এখন সে হঠাৎ এগিয়ে এসে বাবুকে বলে,—আচ্ছা ছেলেটাকে আপনি কি করতে চান নটবরবাবু?

নটবর রায়চৌধুরী—অর্থাৎ জমিদারবাবু তার দিকে তাকান। বলেন,—ওটাকে গাঁ থেকে দূর করে দোব। কোনদিন গাঁয়ে ঢুকলে হাড়-চামড়া দুভাগ করে দোব।

আস্তে আস্তে বলে লোকটি,—গাঁ থেকে যদি দূর করে দেন, তবে ছেলেটাকে আমায় দিয়ে দিন। আমি কলকাতা নিয়ে যাই। আমার একটি বাচ্চা চাকরের বিশেষ দরকার।

জমিদারবাবু একটু ইতস্তত করেন। অবশেষে বলেন,—তা বেশ। মন্দ কি! আপনিই না হয় নিয়ে যান। কিন্তু ছোঁড়া যা ত্যাঁদোড়, কথা শুনবে তো?

ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন,—শুনিয়ে নিতে হবে।

ভদ্রলোক জমিদারবাবুর দূর সম্পর্কের মাসতুতো বোনের বর। ভগ্নীপতি বেড়াতে এসেছেন পুজোয় এদেশে। কলকাতার কোন এক কলেজে প্রফেসারি করেন—সেই কলেজে জমিদারবাবুর বড় ছেলেটি পড়ে। সেই আলাপের সুতো ধরে সম্পর্কের খাতিরে আর ছাত্রের নিমন্ত্রণে আসতে হয়েছে ভদ্রলোককে। ভদ্রলোকের নাম দেবকুমার। খদ্দরের কাপড়জামা পরেন। চোখের চশমাটি পাতলা সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো। লোকটিকে সুন্দর লাগে দেখতে। নিজস্ব একটি চরিত্র বজায় রেখেই যেন চলবার চেষ্টা করেন সব সময়। কোথাও ঠোক্কর খেলে চটেন না। বিরক্ত হলে তাও মুখে প্রকাশ পায় না।

দেবকুমার উঠে পড়েন, ডাকেন লোটনকে,—শোন!

লোটন এগোবার আগেই জমিদারবাবু বলেন নায়েবের উদ্দেশ্যে,—সুধনাকে বলে পাঠাও ছোঁড়াটাকে গাঁ ছেড়ে যেতে হবে দেববাবুর সঙ্গে।

নায়েব ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

দেববাবু আবার ইসারায় ডাকেন লোটনকে বাইরে।

লোটন বাইরে আসতেই ওর পিঠটা চাপড়ে বলেন দেববাবু,—গুড! খুব ভাল!

লোটন ফ্যালফ্যাল করে তাকায়, কি ভাল আর কি গুড ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। দেববাবু বলেন ওকে,—কাল বিকেলে যাব আমি। তৈরী হয়ে

চলে আসবে। কিছু ভয় নেই। আমার বাড়িতে থাকবে, খাবে-দাবে। পড়াশুনো করতে চাও পড়বে। কেমন?

লোটন ঘাড় নাড়ে। লোকটিকে তার মোটামুটি পছন্দ হয়।

কথাগুলো ভারি মিষ্টি আর নরম।

বাড়িতে কে আছে তোমার?

মা, কাকা, কাকিমা।—বলে লোটন।

বেশ তো। তাদের বলবে, কোন ভয় নেই। আমি নিয়ে যাব তোমায়। আবার আসবে মাঝে মাঝে। কেমন?

ঘাড় নাড়ে লোটন।

কলকাতায় কত মজার জিনিস দেখবার আছে। বেড়াবার কত জায়গা আছে। ভালই লাগবে। কেমন?

লোটনকে ঘাড় নাড়তে হয়।

বেশ। তাহলে তুমি বাড়ি চলে যাও। কাল বিকেলে তৈরী থেকো। তোমার নামটা কি?

লোটন।

বাঃ! বেশ নামটি তো।

লোটন মনে মনে খুব খুশি হয়।

দেববাবু বাড়ির ভেতর দিকে চলে যান আর একবার লোটনের পিঠটা চাপড়ে।

বাড়ি চলে আসে লোটন। এসে বাইরে থেকেই শুনতে পায় কাকিমা গোলাপবালার গলা,—দিয়ে এলে তো ছেলেটাকে বাঘের মুখে। নিজে চলে এলে একটা দুধের ছেলেকে ডাকাতের হাতে তুলে দিয়ে।

কাকার গলাটা খুব মিনমিনে,—কি করব, আমি কি ইচ্ছে করে এইচি, লোটনা বললে যে!

লোটনা বললে যে! ভেংচিয়ে ওঠে গোলাপবালা,—একটু হায়াও নেই গা? এত্তবড় মিনষে! মাগী হয়ে ঘোমটা দেয়া উচিত ছেল তোমার।

লোটন ঘরে ঢুকতেই গোলাপবালা ছুটে আসে ওর কাছে,—কি করলে রে? মারলে নিশ্চয়ই খুব?

না মারেনি।—হেসে বলে লোটন,—তুমি মিছিমিছি চেঁচিও নি কাকিমা।

এতক্ষণে সুধন্য বলে ওঠে,—ছাখ দিকি বাবা লোটনা, সেই থেকে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করে দিলে।

কামিনী ঘরের ভেতর আসবার সাহস পায় না। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। চোখদুটো ওর জলে ভরে আসে। লোটনা ফিরে এসেছে! লোটনা যে আবার ফিরে আসবে এমন ভরসা তো আর ছিল না।

এমনিতেই ছেড়ে দিলে হারামজাদারা?—শুধোয় গোলাপবালা।

সুধন্য চমকে বলে,—কেউ শুনে ফেলবে যে! হারামজাদা বলা তখন বেইরে যাবে।

গোলাপবালা সুধন্যর দিকে তাচ্ছিল্য করে তাকায়ও না।

লোটন বলে,—না, একটুও মারে নি! আমাকে কলকাতায় যেতে হবে কাকিমা।

কলকাতায়, কেন?

যাব। কাজ করতে যাব। কাজ পেইচি। বাবুদের বাড়ি কলকাতার এক বাবু এয়েচে, তার সঙ্গে যাব। কাজ করব। টাকা পাব।

ছাই পাবে। বলে গোলাপবালা,—যাওয়া-টাওয়া হবে নি। যেমন আছ, থাক। এখন কাজ করবার বয়েসটা কি হয়েছে শুনি?

তা কলকাতার শহরে যাবে, মন্দ কি। যাক না।—বলে সুধন্য।

ফের তুমি কথা বলচ? চটে ওঠে গোলাপবালা,—বুদ্ধি যখন নেই কথা বল কেন শুনি? যাওয়া ওর হবে নি, ব্যস্!

কামিনী দোরের সামনে তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে।

টুলু বলে,—কবে যাবিরে লোটনা?

কাল। আমাকে যেতেই হবে কাকিমা। বাবুর সামনে পাকা হয়ে গেচে।

তাই বলো। ব্যাপারটা কিছুটা আন্দাজ করে গোলাপবালা—বাবু তোমায় তাড়াবার ফিকির করেচে!

তাড়াবে কেন? তাড়ালেই হল কিনা! কলকাতায় গিয়ে আমার ভালই লাগবে তাই। শহরে তো যাইনি কখনও!

গোলাপবালা কথাটা চাপা দেয়,—আচ্ছা, সে যা হয় হবে খন। এখন গিয়ে চান করে আয়গা। খেয়ে নে। যাও, তুমিও চান করে এসো।

সুধন্য বসেই থাকে।

কই, গেলে চান করতে!

গম্ভীর স্বরে বলে সুধন্য,—না, খাব না আজ।

না খাবে তো না খাবে।—গোলাপবালা শুরু করে।—আবার গোঁসা দেখাচ্ছেন। না খেয়ে কদিন থাকবে শুনি। পেটের জ্বালায় সুড়সুড় করে খেতি হবে।

সুধন্য নীরব নির্বিকার।

তবে আমিও কিন্তু রাগ করতে জানি বলে দিলুম।

সুধন্য গুটিগুটি এগোয় এবার। গোলাপবালার রাগকে ভয় না করে উপায় কি? শেষকালে এক কাপড়ে বাপের বাড়ি চলে যাবে হয়তো মাস কয়েকের মতো। ব্যস্। সুধন্য তখন অন্ধকার দেখবে না তো আর কি দেখবে ছাই।

নিজের ওপরই রাগ হয় সুধন্যর। কেন যে সে গোলাপবালাকে ছাড়া অন্ধকার দেখে! কি যে মুশকিল তার!

স্নান-খাওয়া শেষ হতে হতে দুপুর গড়িয়ে যায়। সন্ধ্যা হতে না হতেই আজ শুয়ে পড়ে লোটন। শরীরটা ভাল লাগে না। মনে হয় খুব কসে ঘুমিয়ে নি। শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়ে ও।

রাত তখনও বেশি হয়নি। লোটনের ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে যায়। ও কপালের ওপর একখানি তপ্ত হাতের স্পর্শ অনুভব করে চমকে ওঠে,—কে?

আমি, খাবিনি?—মায়ের কণ্ঠস্বর।

লোটন চোখ বুজেই বলে,—খিদে পায়নি মা!

একটু কিছু খেয়ে নে। ভররাত উপোস থাকলে শরীর খারাপ হবে।

রান্না হয়েছে?

হ্যাঁ।

চলো।—বলেও শুয়ে থাকে চুপ করে লোটন। মায়ের হাতের স্পর্শটি ওর ভারী ভালো লাগে। কপালে আর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দেয় মা। এমন আরাম ওর আর কিছুতেই যেন হয় না। মার হাতটায় কি যাদু আছে? কাকিমাও তো অসুখের সময় কপাল টিপে দিয়েছে কিন্তু এমন আরাম তো হয় নি। মার হাতটাই বেশি নরম।

আস্তে আস্তে বলে কামিনী,—হ্যাঁরে শহরে যাবি কেন?

এমনি মা। গিয়ে শহর দেখব, কাজ করব, তোমায় টাকা পাঠাব।

না গেলি হয় না?—কামিনীর গলাটা একটু ধরে আসে।

না, মা, যেতেই হবে।

আমায় না দেখে থাকতে পারবি?

লোটন চুপ করে থাকে। কথাটা এতক্ষণ সে একবারও ভাবেনি। মাকে না দেখে কি থাকতে পারবে ও? ঠিক বুঝতে পারে না লোটন। শহর ওর কেমন লাগবে, মাকে না দেখেও শহর দেখতে ভাল লাগবে কি না—সবই যেন আবছা আবছা মনে হয়।

কামিনীর চোখের জল অন্ধকারে দেখা যায় না। চোখে জল ছিল কি ছিল না, কে জানে। ওকে বলতে শোনা যায়,—আমি কি করে একা থাকব রে লোটনা!

কটা দিনই বা।—সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে লোটন বলে,—কিছুদিন পরেই ফিরে আসব।

ঠিক এসবি তো?

ঠিক আসব মা।

শহরে গিয়ে ভুলে যাবি নি তো?

না না, কি যে বলো!—চলো, খেতে দেবে চলো।

উঠে পড়ে লোটন আর কথা না বাড়িয়ে। মনে মনে মায়ের মতো আর একজনের কথাও ওর মনে হয়। ওই বুড়োশিবটা। ওটাকে বলে আসতে হবে কলকাতায় যাবার কথা। লোটনের কাছে পাথরটা জীবন্ত। সব কথাই ওকে বলা চাই এবং বললে যে পাথরটা শুনতে পায় এ বিশ্বাসও ওর ধ্রুব।

পরদিন দুপুরের শেষে সন্ধ্যার গোড়ায় বুড়োশিবতলায় হাজির হয় লোটন। পশ্চিমের আকাশে সূর্যের আলোর শেষ রক্তাভা তখনও কাটে নি। এই সময়টাই মন্দিরে যেতে ভাল লাগে লোটনের। খুব নির্জন নীরব মনে হয় তখন জায়গাটা। বাদুড়ের ডানার ঝটপট আর নানা পাখির নীড়ে ফেরায় কলরব শুরু হয়। মানুষের কণ্ঠস্বর বড় একটা শোনা যায় না।

মন্দিরে ঢুকে পাথরটাকে জড়িয়ে ধরে ও।

চললুম বুড়ো একেবারে কলকাতা।

কত কোশ দূরে কে জানে। আর তোকে কেউ পরিষ্কার করতে আসবে নি। বুঝবি মজা। বলে কাপড়ের খুঁটো দিয়ে পাথরটাকে পরিষ্কার করতে থাকে লোটন।

আর দেরি করলে চলবে না। সন্ধ্যেবেলা গাড়িতে উঠতে হবে। দেখিস, কাঁদিস নি যেন আমার জন্যে। আবার আসব। দেরি করব নি বেশি দিন।

কিরে ততদিন ঠিক থাকবি তো। আর কাউকে যেন মন্দিরে আসতে দিস নি। নে তোকে একটা পেন্নাম করি!

বলে পাথরের গোড়ায় মাথাটা ছুঁইয়ে চলে আসে।

বাড়ি এসে দেখে সব তৈরী। দুর্গা বলে এবার বেরোতে হবে। গোলাপ আঁচলে চোখ মোছে,—কবে এসবি বাবা?

আসব। কেঁদো নি অমন করে।

শরীর একটু কাহিল মনে হলেই চলে এসবি বল?

কামিনী ওর কড়ে আঙুলটা কামড়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঝেড়ে দেয়। কথা বলতে আর পারে না। চোখের জলে আর আবেগে গলা বন্ধ হয়ে আসে।

• তুমি যে কি মা। বলচি তো টাকা আনব শহর থেকে।

ইতিমধ্যে ঘোড়ার গাড়ির শব্দ আসে কানে।

ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর,—এই বাড়ি তো? লোটন ছেলেটির নাম!

গাড়োয়ান বলে,—হ্যাঁ বাবু। তারপর হাঁকে,—লোটনা!

লোটন পুঁটলিটা নিয়ে এগিয়ে আসে।

তুগগা—তুগগা।

সুধন্য এল। চোখ মুছতে মুছতে টুলু এগোয়।

গোলাপবালা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকে।

কামিনী এগিয়ে আসে গাড়ির সামনে সকলকে অবাক করে,—দেখবেন একটুকু বাবু। লোটনকে আপনার হাতে তুলে দিনু, আপনার জিম্মায় রইল।

বলে তফাত থেকে বাবুটিকে প্রণাম করে কামিনী।

কোন ভয় নেই।—বলেন দেবকুমারবাবু,—ও তো আর জলে পড়ছে না। তোমাদের ছেলে আবার ফিরে আসবে।

লোটন গাড়ির ওপর ওঠে।

গাড়োয়ান উঠে পড়ে।

গাড়ি চলে।

সড়কের ধুলো এসে লাগে গাড়ির পিছন থেকে কামিনীর চোখে মুখে।

গাড়ি ততক্ষণ সড়কের বাঁক পার হয়ে চোখের আড়ালে চলে গেছে।

গোলাপবালা এগিয়ে আসে। বাড়ির ভেতর নিয়ে যায় কামিনীর হাত ধরে।

শহর কলকাতায় এসে পৌঁছুল ওরা। ঘোড়ার গাড়িতে আসতে আসতে তাকায় লোটন চারদিকে। উঁচু বড় বড় বাড়ি। বাবুদের বাড়ির চেয়ে দশ ডবল উঁচু। উরে বাপ! ওপরের দিকে তাকিয়ে অবাক হয় লোটন। বাড়িগুলো যেন আকাশ ছুঁই-ছুঁই। পাশ দিয়ে গাড়ি বেরিয়ে যায় নিমেষে কতগুলো! আমবাগানের ঝড়ের চেয়েও বেশি জোরে যেন। চারিদিকে একটানা কলরব। কানের ভেতরটা ভোঁ ভোঁ করতে থাকে। মাথাটা টনটন করে। নীচের দিকে তাকায়। রাস্তাটা ঝকঝকে। পাথরের তৈরী কি? অত বড় বড় গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে, একটুও ধুলো নেই। মানুষগুলোও অদ্ভুত। ধবধবে জামাকাপড়। বাবুদের বাড়ির জামা-আঁটা ঘোড়াগুলোর মতো। সব যেন ছুটছে! জুতোর খস্‌খসানি—খালি পায়ে নেই কেউ? আছে। রাস্তায় ধারে ধারে জায়গায় জায়গায় কিছু কিছু মানুষ দেখতে পায় লোটন। তাদের জামা নেই, কাপড় নোংরা, খালি পা। হাতে বাটি কিম্বা কোলে ছেলে। এখানে ওখানে হাত পাতছে। ভিখিরী বোধহয়। তবু এদের দেখে একটু অবাক হয় লোটন। তারাও তো এদেরই মতো একই জাত। গাঁয়ে এরা ছোটলোক আর শহরে ভিখিরী। গাঁয়ে এরা আধি বন্দোবস্তে জমি নেয়, না খেয়ে খাজনা দেয়, শহরে ভিক্ষে করে সুর করে করে, কানা খোঁড়া হয়ে।

এদের সঙ্গে বেশ মিল দেখে লোটন একটু খুশি।

আর সব মানুষগুলো যেন অনেক তফাত—ভদ্দরলোক, ফরসা-ফরসা বাবু। শুধু কি তাই? সায়েবের ছড়াছড়ি। মিনিটে একগণ্ডা কোটপাণ্টলুনপরা সায়েব, ফরসা সায়েব, মাঝারি সায়েব, বেঁটে সায়েব, লম্বা সায়েব। বাবা!

বিচিত্র একদেশে এসে পড়েছে লোটন। এখানে কুমোর নেই, তাঁতী নেই, চাষী নেই, একটাও তো চোখে পড়ল না। এ কেমন দেশ রে বাপু!

গাড়ি এসে দাঁড়ায় একটা পাঁচতলা বাড়ির নীচে। গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে পা ফসকে যায় দুবার। বাবু গাড়িভাড়া মিটিয়ে দেন। তারপর লোটনের কাঁধে বিছানাটা চাপিয়ে বলেন,—চল।

স্যুটকেশ হাতে নিয়ে এগোন বাবু।

• লোটন পিছুপিছু এগোয় বিছানা আর নিজের পোঁটলা নিয়ে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে আবার বার দুই পড়তে পড়তে বেঁচে যায় লোটন। জীবনে এই প্রথম সিঁড়ি দিয়ে ওঠা। এর চেয়ে নারকেলগাছে ওঠা ওর পক্ষে অনেক সোজা। খাঁজ-খাঁজ সিঁড়ি, ঠিকমতো একটার পর আর একটায় পা না পড়লেই কুপোকাত।

খুব দেখে দেখে উঠতে হয়।

ওর ওঠার ধরন দেখে বাবু হাসেন।

দোতালায় উঠে একটা বন্ধ দরজার সামনে এসে কড়া নাড়েন বাবু।

দরজা খুলে যায়। পনেরো-ষোলো বছরের একটি মেয়ে এসে দোর খুলে দেয়,—ওমা, বাবা এসেছে!

দেবকুমারবাবুর মেয়ে—ঝুনু।

লোটন তাকায় দুবার মেয়েটার দিকে। গায়ের রঙ যেন গাওয়া ঘির মতো। বুলবুলি পাখির মতো দুটি ছোটছোট ঠোঁট। মাথায় কোঁকড়া থোপা-থোপা চুল, পিছনে বেণী। পায়ে স্যাণ্ডেল। হাতে বই। টানা পরিষ্কার চোখে ভেতরের মণিদুটো যেন ফিঙের মতো নাচছে। দুবার দুলে ওঠে মেয়েটা। দেবকুমারবাবু ডাকেন লোটনকে,—ভেতরে চলো।

ভেতরে ঢোকে লোটন।

দেবকুমারবাবু ঢুকতেই সামনে বেরিয়ে আসেন এক ফরসা মাংসল মহিলা।

চেহারার ভেতর চোখদুটিই নজরে পড়ে। পিঙ্গল চোখ দুটি—যেন জ্বলছে। বিঁধে পড়ে সেখানে, যেখানে সে তাকায়।

লোটনের চোখে চোখ পড়তেই লোটন চোখ নীচু করে। চাউনিটা সইতে পারে না।

এটা কে? শুধোন দেবকুমার-গৃহিণী,—বেলা দেবী।

দেবকুমারবাবু একটু মিষ্টি হাসেন, প্রশ্নের উত্তাপটা কিছু শীতল করতেই যেন। তারপর বলেন ধীরে ধীরে,—লোটন। বড় ভাল ছেলেটি। নিয়ে এলাম। আমাদেরও তো একটি লোকের দরকার।

চেহারাটা আগাপাস্তলা একবার দেখে নেন গৃহিণী,—এযে একেবারে ভূত!

আবার হাসেন বাবু,—ভূত হোক, ভবিষ্যতে তুমি একে মানুষ করে নেবে।

ঝুমু নাক কোঁচকায়,—মায়ের কথার প্রতিধ্বনি করে,—কি ভীষণ বিচ্ছিরি।

এত বাচ্চা চাকর দিয়ে কি হবে শুনি? আরও যা গুছোনো আছে, সব ওলটপালট করে দেবে।—বলেন গৃহিণী।

ঠিক চাকর নয়।—বলতে চান দেবকুমারবাবু।

তবে কি?

ওই মানে থাকবে, খাবে-দাবে,—ফরমাস খাটবে, তার ভেতর একটু সময় পেলে পড়তে চেষ্টা করবে।

তবে হোস্টেলে রেখে পড়াও।—বলেন বেলা দেবী।

দেবকুমারবাবু কথা বলেন না। ঘরে ঢুকে পড়েন।

ভেতর থেকে ডাকেন,—ঝুমু, আমার সাবান-তোয়ালে নিয়ে এসো।

বেলা দেবী লোটনের কাছে আসেন,—তোর নাম কি? উঃ কি গন্ধ তোর গায়ে! কোথাকার ভূত ধরে নিয়ে এল। ছি ছি। নাম কি তোর?

লোটন তাকায়—ভয়ে ভয়ে তাকায়। নিজের চেহারার সঙ্গে এদের চেহারার তুলনা করে এতক্ষণে লোটন ভারি সংকুচিত হয়ে ওঠে।

ঘর মুছতে পার?

না।

বাসন মাজতে পার?

না।

বেলা দেবী ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসেন,— খেতে পার?

লোটন কথা বলে না।

আবার শুধোন বেলা দেবী,—কি জাত তোরা? রান্না করতে পারবি? কি জাত?

হালুইকর।

• তবেই হয়েছে। একটা ইডিয়ট ছোটলোকের ছেলেকে ধরে এনেছে কোথা থেকে।—ওপাশের ঘরের দিকে নজর রেখে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে—মাস্টারি করলে কি কমনসেন্স এত নষ্ট হয় মানুষের! এটাকে দিয়ে কি কাজ হবে? মাঝ থেকে আমার ঝকমারি।

দেবকুমারবাবুর সাড়া পাওয়া যায় না।

বেলা দেবী লোটনের দিকে তাকিয়ে বলেন,—তোর কে আছে।

লোটন বিস্ময়ে আর অজানা এক আশঙ্কায় হতভম্ব হয়ে থাকে। কথার উত্তর দিতেও যেন চট করে পারে না। এখানকার প্রতিটি মুহূর্ত ওর মনের ভেতর বিঁধে পড়ে।

কিরে, বোবা নাকি?

দেবকুমারবাবু তোয়ালে কাঁধে বেরোন কলঘরে যাবার জন্যে।

বোবা নাকি—শুনে দাঁড়ান, একটু হেসে বলেন,—বোবা থাকবে না বেশিদিন। তোমার ট্রেনিংয়ে দুদিনেই মুখর হয়ে উঠবে ঠিক। বেচারা সবে এসেছে। ধাতস্থ হতে দাও।

লোটন বাবুকে দেখে একটু ভরসা পায়।

গৃহিণী মুখটা একটু বেঁকিয়ে জবাব দেন—এটাকে নিয়ে এখন করি কি?

কিছু করতে গেলেই মুশকিল বাধাবে। আবার বলেন দেবকুমারবাবু,—তার চেয়ে বরং তুমি কিছু না করে করবার ভারটা ওর ওপরই ছেড়ে দাও না।

বেলা দেবী বলেন,—তোমার চোখা-চোখা কথাগুলো ওর সামনে কিন্তু ভারি ভাল শোনাচ্ছে।

একটু হাসেন আবার দেবকুমারবাবু,—দেখো, ভাল-খারাপ বোঝবার মতো সময় এখনও ওর আসেনি। সে সময় এলে ওকেই বরং শুধিয়ো।

তারপর লোটনের দিকে তাকিয়ে বলেন,—যা বিছানাটা ঘরে রেখে চান করে নে।

চলে যান দেবকুমারবাবু।

লোটন যেতে চায়।

থামান বেলা দেবী,—দাঁড়া, কাপড় এনেছিস ?

হুঁ।—উত্তর দেয় লোটন।

বার কর।

পুঁটলিটা খুলে কাপড় দুখানা বার করে লোটন, আর একখানা কাঁথা ছেঁড়া, ছোট একটা বাটি, একটি গেলাস, থালা।

নাকে কাপড় দেন বেলা দেবী,—উঃ কি বিচ্ছিরি গন্ধ! নোংরা কোথাকার!

লোটন অবাক। এদের প্রাথমিক ব্যবহারটাই ওর কিশোর মনে এক অভিজ্ঞতা আনতে শুরু করেছে যে ওরা নোংরা, ওদের ছুঁতেও ঘেন্না করে।

মানুষের ঘৃণা কুড়িয়ে কুড়িয়ে ওরা বড় হয়েছে। নিতান্ত সাধারণভাবেই লোটনের যেখানে অন্যায় মনে হয়েছে যে কেন তাদের সবাই ঘৃণা করবে সেখানেই সে প্রতিবাদ করতে গেছে তার সবটুকু শক্তি দিয়ে। সেই প্রতিবাদের পরিণামেই তার আজ এখানে আসা। এখানে আসবার পরমুহূর্ত থেকে সেই আঘাত! আঘাতগুলো আরও তীব্র আরও ছুঁচোলো।

লোটনের কান দুটো আর রাঙা হয়ে ওঠে না। চোখ দুটো শাদা জোলো তালশাঁসের মত দৃষ্টিশূন্য হয়ে উঠে। প্রতিবাদে নয়—এক গভীর নিরাশায়।

এ ঘৃণার কি শেষ নেই ? কত আটকাবে লোটন!

শোন।—বেলা দেবী বলেন,—সব কাপড় ভাল করে সাবান দিয়ে কাচবি। সব কাপড়। কাঁথাটাও। নোংরাতে আমার বমি আসে। এখানে ওসব চলবে না। গায়ে ভাল করে সাবান মাখবি। চুল কাটিয়ে দেব কাল। যা, কাপড়-কাঁথা নিয়ে কলঘরে যা। সাবান দিচ্ছি। আর একখানা ছোট কাপড় দিচ্ছি, এই কাপড়খানা পরবি চান করে উঠে। পরে বিকেলে সাবান দিয়ে কেচে দিবি।

লোটন তেমনি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

কাপড় যে সে কখনও কাচেনি এ কথা আর মুখ ফুটে বলতে সাহস হয় না।

ওখানে তো সব কাপড়ই মা কাচত সোডায়। কি করে সাবান মাখাতে হবে, তাও তো জানে না ও।

বেলা দেবী সাবান আর একখানা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে যান—বলেন আবার,—দুটো প্যান্ট কিনে নিবি কাল। এইটুকু ছেলের কাপড় পরা—হ্যাস্টি। কি গেঁয়ো রে বাবা!

লোটন একটা কথারও জবাব দেয় না। কাপড়-কাঁথা নিয়ে কলঘরের সামনে যায়।

দেবকুমারবাবু কলঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। লোটন ঢোকে।

ট্রেনের ঝাঁকুনিতে আর রাস্তার নানা চিন্তায় ওর মাথাটা এমনি টনটন করছিল। কলঘরে ঢুকে কাপড়গুলোর দিকে তাকিয়ে ও আর দাঁড়িয়ে থাকবার সামর্থ্য পায় না। কি করে এখন ও কাপড় কাচবে! চোখ দুটো জ্বালা করে ওর। রাঙা হয়ে উঠছে চোখ দুটো। ঘুম পাচ্ছে। চোখে জল ছিটিয়ে দেয়, যদি ঘুম পালায়। সন্ধ্যেবেলা যখন ঘুমিয়ে পড়ত সে, ঘুম থেকে উঠিয়ে চোখে জল দিত মা ঘুম ভাঙাবার জন্যে। তেমনি করে জল ছিটিয়ে দেবার চেষ্টা করে লোটন।

কাপড় নিয়ে বসে।

ভিজিয়ে সাবান দিতে থাকে। হাত আর চলে না। অচল হয়ে আসে যেন। তবু তাকে কাচতে হবে কাপড় এই সব কাপড়। তাকে থাকতে হবে কলকাতায়। তাকে চাকর হতে হবে।

আবার সাবান মাখে কাপড়ে।

দুপুর স্নান করে অনেকক্ষণ বারান্দায় বসে থাকে। এখনও খেতে দেয় নি। বেলা দেবী রান্নাঘরে। ঝুনু পড়াশুনো সেরে মাকে এটা ওটা এগিয়ে দেয় হাতের কাছে। দেবকুমারবাবু কিছু জলযোগ করে বাইরে বেরিয়ে যান।

একটু তেল এনে দে তো ঝুনু।

ঝুনু তেল আনতে যাবার সময় দেখে লোটন বসে চুপ করে। একটু কড়া দৃষ্টি হেনে পাশ কাটিয়ে যায় ঝুনু। তেল নিয়ে মাকে দেয় আর বলে,—আচ্ছা মা, এবার ঠিকে ঝিটাকে বিদেয় করলে কেমন হয়?

বাসন মাজবে কে, বাটনা বাটবে কে?

কেন, ওই ছেলেটা।

বেলা দেবী একটু খুশিই হন মেয়ের ওপর। তবু একটু গম্ভীর হয়ে বলেন,—আচ্ছা সে আমি দেখবখন। তোমায় তো বলেছি, সংসারের কোন ব্যাপারে তুমি মাথা ঘামাবে না। তোমার সামনে পরীক্ষা। পড়াশুনোর কথা ভাবাই কি ভাল নয়!

ঝুনু জানত মা এরকম একটা উত্তর দিতেও বা পারে। মা সব ব্যাপারে কত কড়া। তাকে মানুষ করবার জন্যে দুশ্চিন্তার অন্ত নেই মায়ের।

একটু বিরক্ত হয় ঝুনু,—তা বলে একটা অন্য কথাও বলতে পাব না?

না, বলা উচিত নয়,—বলেন বেলা দেবী,—যখন সংসার করবে তখন ভাববে।

ঝুনু চুপ করে থাকে গুম হয়ে। কথায় উত্তর দিতে গেলে আরও পাঁচটা কড়া উপদেশ শুনতে হবে। হঠাৎ ঝুনু বলে,—মা, এই দেখ।

বেলা দেবী তাকালেন। দেখেন লোটন ঘুমে ঢুলছে বসে বসে বারান্দায়।

কি ভীষণ ইডিয়টের মতো চেহারা, না মা?—ঝুনু হাসতে হাসতে বলে।

বেলা দেবী বলেন,—যা, উঠিয়ে দিয়ে বল, মা ডাকছে।

আমি ডাকতে পারব না।

কেন?

না, ও আমি পারব না।

বেলা দেবী আর কথা না বলে সোজা বারান্দায় এসে ঠেলা মারলেন লোটনকে,—এই ওঠ্।

লোটন চমকে তাকায়। বেলা দেবীকে দেখে ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে।

দুপুরে ঘুমোতে নেই। ওঠ্, ঝাড়ন নিয়ে ঘরের মেঝেটা পরিষ্কার করগে যা। ঝাড়নটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন।

লোটনকে উঠতে হয়। রক্তাভ চোখে জল দিতে আবার কলঘরের দিকেই যেতে হয় ওকে।

দিন কতক কাটে। কয়েকদিনের নিদারুণ অভিজ্ঞতায় লোটন সংসারের অনেকখানি পরিচয় পায়। পৃথিবীটা যে এমন কে জানত। কে জানত যে মানুষ নিজের স্ব-কেন্দ্রেই ঘুরপাক খাচ্ছে দিবারাত্র। কার কি ঘটল, কার কি হল

দেখতে জানে না,—দেখবার চেষ্টাই বা করে কই। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার আশ্চর্য প্রয়াস সর্বত্র। তারপর যদি সময় থাকে, সংসারটাকে দেখবার চেষ্টা করে নিজের স্বার্থান্বেষী মন নিয়ে! তাই তো এত হানাহানি। প্রেম নেই। একবিন্দু ভালবাসা নেই। লোটন এটুকু পরিষ্কার বুঝতে পারে যে ভালবাসা পাবার স্থান এ সংসারে বড় কম।—হয়তো বা নেই-ই। হয়তো বা একটু কৃপা—একটুখানি দয়া—তাই যেন অনেক বেশি দিয়ে ফেলল! এত দয়ালু হলে চলে না!—এই মন্তব্য।

লোটনরা ছোটজাত, গরীব।—এটা গাঁয়েও যেমন শুনে এসেছে, এখানেও তার চেয়ে কম নয়। অথচ ছোটজাত গরীব তো সে নিজে ইচ্ছে করে হয়নি। তার দোষটা কোথায়, আর দোষ যদি না থাকে তবে অনর্থক ঘৃণা কুড়িয়ে বেড়ায় কেন? এই সামান্য প্রশ্নটার মীমাংসা সে কিছুতেই করে উঠতে পারে না। এর ভেতর কোথায় যেন কতকগুলো মানুষের একটা কারসাজির ফাঁক আছে। আবছা-আবছা মনে হয় ওর, একদল ভদ্দরলোক আছে বলে তারা লোটনদের ছোটলোক বলে সংসারে চালাচ্ছে। এই ভদ্দরলোকের দল যদি না থাকত?—বাঃ বেশ লাগে ভাবতে লোটনের। ভদ্দরলোকের দলটা না থাকলে কেমন হত। সবই ছোটলোক গরীব—কে কাকে বলবে বলো!

ভাবতে ভাবতে আকাশের দিকে তাকায় লোটন। আকাশের তারাগুলোর ভেতর কি ভদ্দর আর ছোট আছে নাকি? আকাশটাকে নিয়েও কি ওরা টানা হেঁচড়া করবে এমনি করে? কে জানে! চুপচাপ জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকে সন্ধ্যার আকাশের দিকে। কুঁচি কুঁচি নক্ষত্রদের ভিড়ে ঠাসা। তাদের গাঁয়েও এমনি আকাশ দেখেছে। তফাত নেই। দেখেছে কত সন্ধ্যায় বিলের ধার থেকে গোটাকতক কাছিম অথবা হাট থেকে ভাল গুলি কিনে নিয়ে ফেরবার পথে! সারি সারি হাটের লোকরা যাচ্ছে, মাথায় ঝাঁকা। কেউ গানের সুর ঢেলে দিয়েছে বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। কেউবা হাতে ধরে বাচ্চা ছেলেটাকে তড়পাতে তড়পাতে যাচ্ছে। কেউবা পাশের যাত্রীর সঙ্গে কথা বলে হিসেব করছে তার বেচাকেনার, কত সন্ধ্যা গেছে এমন!

লোটনরা ফিরতে ফিরতে হয়তো বা নেমে গেছে মটরশুটির ক্ষেতে। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে ক্ষেত থেকে পটাপট মটরশুটি ছিঁড়ে কোচড় ভর্তি করে খেতে খেতে ফিরেছে বাড়ি। বুক ভরে নিশ্বাস নেওয়া যেত সেখানে। এখানে নিশ্বাসও যেন মনে হয় দেওয়ালে আটকে যায়। অনেক অনেক দূরে আকাশে মিশে যায় না। চোখের দৃষ্টিতে ধাক্কা লাগে যেন। যেদিকে তাকাও দেয়াল। কোথাও মাটিটা শেষ সীমানায় গিয়ে বনরেখার সঙ্গে আকাশে মিশে যায়নি। ভাল করে দম নিতে পারে না লোটন।

টিনের ভাঙা সেই রান্নাঘরটায় বসে মা হয়তো এতক্ষণে ভাত চড়িয়েছে উনুনে। দূর থেকে শেয়াল-কুকুরের ডাকটা বাতাসে কান্নার মতো ভেসে আসে কানে। মা হয়তো রান্নাঘরের ছোট খুপরিটা দিয়ে তাকিয়ে আছে এই আকাশের দিকে। ভাবছে লোটনের কথা। কে জানে!

খিদেতে পেটটা মোচড় দিয়ে ওঠে একবার। লোটন পেটটা চেপে ধরে তেমনি বসে থাকে। ওপরে ঝুনুর পড়বার শব্দ কানে আসে। বাবু আর গিন্নিমা বেরিয়েছেন বায়স্কোপে। ঝুনুর খাবার ঢাকা আছে,—আর লোটনের খাবারের কথাটা ভাববার কথা ভুলে গেছেন ওরা।

এত খিদে পায় লোটনের! ও যেন স্থির থাকতে পারে না।

একটা ব্যাপারে অবাক হয়ে যায় লোটন—বেশি খাওয়া এরা পছন্দ করে না। প্রথম দুদিনে প্রথমবারের ভাতটা শেষ করবার পর গিন্নিমা দ্বিতীয়বার বললেন,—ভাত দেব রে?

লোটন চুপ করে রইল।

দিলেন এক হাতা, লোটনের এক গ্রাস।

আবার শুধোলেন,—ভাত দোব?

এতবার শুধোবার কারণটা বুঝল না লোটন। একমুঠো ভাত দিয়ে দুবার তিন বার—ভাত দোব—ভাত দোব, সাধবার অর্থ টা লোটন ঠিক বুঝে উঠতে পারেনা।

তৃতীয়বার এক হাতা ভাত দেবার পর, লোটন যখন দু গেরাসে সেটা নিঃশেষ করে তখন ঝুনু ওপাশ থেকে মুখে আঁচল গুঁজে খিলখিল করে হেসে উঠেছে।

লোটন অবাক হয়ে তাকায়। ঝুনু ঘরে চলে যায়। গিন্নিমাও হেসে ফেলেন।

তারপর একথালা ভাত উপুড় করে ঢেলে দিয়ে যান—যেন মজা দেখতে অথবা বিরক্ত হয়ে।

একথালা ভাত অনায়াসে খেতে আরম্ভ করে লোটন। তাকিয়ে একবার দেখেও না যে ঝুনু ওপাশের জানালা দিয়ে বাবাকে টেনে এনে তার খাওয়া দেখাচ্ছে! সবাই ওরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে। চিড়িয়াখানায় বাঁদরকে কলা খাইয়ে যেমন অবাক হয় আর মজা পায়—তেমনি।

গিন্নিমাও হাঁ করে দেখছেন ওর খাওয়া। খাওয়া শেষ হবার আগে একবার মুখ তুলে দেখে লোটন, সবাই ওর পাতের দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে।

ও থতমত খেয়ে ভয় পেয়ে যায়।

কোনমতে খাওয়া সেরে আঁচাতে যায় থালা নিয়ে।

বিকেলে শুনতে পায় বেলা দেবী বলছেন দেবকুমারবাবুকে,—এ যে খুদে রাক্কস দেখছি! ওরে বাবা, ওইটুকু ছোঁড়া—ওর স্টমাকে ম্যাজিকের মতো আধ হাঁড়ি ভাত কি করে গেল তাই ভাবচি।

বলতে বলতে হাসি।

দেবকুমারবাবু কলেজের খাতা দেখছিলেন, খাতা থেকে মুখ তুলে বলেন,—কলের জল দুদিন পেটে পড়লেই ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ধরে যাবে, ভয় নেই। একমুঠো ভাত খেলেই তখন পাঁচটা ঢেকুর তুলবে দেখো!

অত বেশি খাওয়া বুঝি ভাল?

হজম করতে পারলে আর খারাপ কি? হজম করতে ওরা পারে। গাঁয়ের বাতাসে খেলে বেড়ায়, হজম হয়ে যায়। দুদিন পর দেখো কি হয়!

বেলা দেবী হাসেন,—থাক্‌ বাপু, দুদিন দেখে আর কাজ নেই। কাল থেকে মাপা চালের ভাত দোব, তাতে ওর পেট ভরে ভরবে, না ভরে না ভরবে।

সেটা কি ভাল হবে?

তবে কি দেড় মন চাল ওকে মাসে খাওয়ানোটা খুব ভাল হবে। চার টাকার মাস্টারি করো, তা অত কোথা থেকে আসবে?

ঝুমু ঘরে ঢোকে। ঝুমুকে দেখে বেলা দেবী চুপ করেন। ঝুমুর-সামনে সংসারের কোন কথা বলেন না। ঝুমু এসেই হাসতে হাসতে বসে পড়ে।

কি হল রে?

আবার হাসি। হাসির বেগে কথাই বলতে পারে না ঝুমু।

কি হল? অত হাসছিস কেন?

জানো মা, লোটন আবার খেতে চাইছে। বলছে, মুড়ি-টুড়ি কিছু আছে।

মুড়ি!—বেলা দেবী অবাক।

ঝুমু হাসতে হাসতে আবার কাত,—দুপুরের ওই খাবার ওপর আবার যদি ধামাখানেক মুড়ি চায়! দাও না মা—এক ধামা মুড়ি কিনে। দেখব কেমন খায়?

দেবকুমারবাবু ভ্রূ দুটো একটু কোঁচকান,—অত হাসছ কেন খুকী?

একটু বিরক্ত হলে দেবকুমারবাবু ঝুমুকে খুকী বলেন।

উত্তর দেন বেলা দেবী,—ওর হাসবার দোষটা কি? হাসির ব্যাপার হলে কি কাঁদবে?

দেবকুমারবাবু খাতার ওপর চোখ রেখে বলেন,—যাও দেখো, পরোটা লুচি কিছু থাকলে দাও ওকে।

বেলা দেবী উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে যান।

বাইরে গিয়ে দেখেন লোটন বসে আছে বারান্দায়।

বেলা দেবীকে চোখ দুটো বড় বড় করে আসতে দেখে লোটন ভয় পেয়ে যায় ওই বিড়ালাক্ষী গিন্নিমাকে লোটন বড় ভয় করে। কেন যে ভয় করে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। ভয় ও ছোটবেলা থেকে কাকেও করেনি। দেশের বাবুদেরও নয়। কিন্তু এই গিন্নিমার ভেতর এমন একটা ভীতিপ্রদ কিছুর আভাস লোটন পায় যে আপনা থেকেই একে দেখলে লোটনের ভয় আসে। মনে হয় লোটনের সব কিছুই যেন এঁর চোখে মহা অপরাধ। সব কিছু এঁর কাছ থেকে লুকোতে পারলে বাঁচে। এমন কি খিদেটাও।

তোমার কি খিদে পেয়েছে?

হ্যাঁ।

বেলা দেবী শিক্ষিতা। বইয়ে পড়া শিক্ষার মাপে তুনিয়ার বিচার করা তাঁর অতি প্রিয়—তাই সেই ঢঙেই বলেন,—দেখো, খাওয়াটা অভ্যাস। বেশি খাওয়া অভ্যাস করাটা অসভ্যতা আর খাদ্যের অপচয়—ওতে ওয়েস্ট হয় অনেক বেশি। এখন থেকে তোমার কম খাওয়া অভ্যাস করতে হবে। অবিশ্যি প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হলেও পরে সয়ে যাবে, বুঝলে। একটু সভ্য হতেই হবে তোমায়। এমন অসভ্যতা আমি এ বাড়িতে কিছুতেই হতে দোব না।

লোটন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। ইংরিজী-মিশোনো ভাল ভাল বাংলা কথা বেশিটাই বোঝে না, শুধু এটুকু বোঝে যে খেতে তাকে দেয়া হবে না। লোটন চুপ করে থাকে।

অমন হাঁ করে তাকিয়ে রইলে কেন ?—বুঝলে কি বললুম ?

লোটন মাথা নাড়ে।

কি বুঝলে ?—বেলা দেবী শিক্ষয়িত্রীর ভঙ্গীতে বলেন।

মহা বিপদ। মাথা নেড়েও বিপদ। আবার চুপ করে থাকে লোটন।

কি, বোবা নাকি ? চটেছেন বেলা দেবী।

লোটন ধমক খেয়ে আরও বেসামাল। না বলতে পারে হুঁ হাঁ—না বুঝতে পারে কিছু।

ঝুনু পাশে দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে তাকিয়ে সুন্দর ভ্রূ তুটি কুঁচকে বেলা দেবী নিতান্ত বিরক্ত হয়েই বলেন,—এটা একেবারে হাবা দেখছি রে ?

মোস্ট ইডিয়ট। মাথায় কিছু নেই মা।—বিনুনিটা নেড়ে বলে ঝুনু।

দেবকুমার বাবু বেরিয়ে আসেন,—লোটন !—ডাকেন।

লোটন এতক্ষণে নিশ্বাস ফেলতে পারে।

এসো, এ ঘরে এসো।

বেলা দেবীও একটু জোরে বলেন,—লোটন যেও না।

লোটন কার কথা শুনবে স্থির করতে পারে না।

দেবকুমারবাবু একটা নিশ্বাস ফেলে ঘরে ঢোকেন আবার।

বেলা দেবী আর কথা না বলে বারান্দায় যান।

সেদিন থেকেই লোটন কম খেতে শুরু করেছে। বেশি খেতে লজ্জা করে, ভয় করে। এরা পছন্দ করে না। খিদেতে আজ সন্ধ্যায় পেটে কেমন একটা ব্যথা হতে থাকে। পেটটা চেপে ধরে লোটন তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। মায়ের কথা আজ ওর বড় বেশি করে মনে পড়ে—মা'র—আর ওই বুড়ো শিবটার কথা।

বাবু আর গিন্নিমার বায়স্কোপ থেকে আসতে অনেক দেরি। কখন লোটন খেতে পাবে কে জানে! ঝুনু ওপরে পড়ছে। উঠে পড়ে লোটন। দু গেলাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে নেয়।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে চমকে ওঠে লোটন। কে আবার এল। হয়তো বাবুর কোন ছাত্র। ছাত্ররা তো মাঝে মাঝেই আসে দেখেছে লোটন। দোরটা না খুলেই বলে,—বাবু বাড়ি নেই।

ঝুনু পড়া ফেলে ছুটে আসে! হঠাৎ রেগে লোটনকে বলে,—উল্লুক! জানে না শোনে না বাবু বাড়ি নেই! হীরুদা এসেছে।

ঝুনুই দোরটা খুলে দেয়।

হীরুদা ঢোকে। লম্বা-চওড়া ছেলে একটি। চুল ব্যাক ব্রাস, হাতকাটা সার্ট, মালকোঁচা-দেয়া কাপড়, পায়ে কাবলী জুতো। হাতে একখানা মোটা বই।

মোটা ঠোঁট দুটো কামড়ে লোমশ ভুরু কুঁচকে শুধোয় ঝুনুকে, বাড়ি নেই কে বলছিল?

ঝুনু লোটনকে দেখিয়ে দেয়—এই একটা ব্লক-হেড চাকর এনেছেন বাবা বন্ধুর ওখানে বেড়াতে গিয়ে। একেবারে জ্বালাচ্ছে আমাদের হীরুদা।

অ।—বলে মোটা বইখানা ঘোরাতে ঘোরাতে লোটনের মাথায় খটাং করে মেরে বলে,—এই ছোঁড়াটা? চলো, ঘরে চলো।

লোটন মাথায় বইয়ের ঠোক্কর খেয়ে মাথাটায় একটু হাত দেয়। ওর সবেতেই এখন অবাক হবার পালা। চুপ করে আবার চলে যায় পাশের ঘরে জানলার ধারে।

হীরুদা—ঝুনুর মাসতুতো ভাই হয় সম্পর্কে। বাপ সদরওয়ালা—স্ত্রীকে

পকেটে করে নিয়ে বেড়ান। ছেলেকে কলকাতায় বোর্ডিংয়ে রেখে পড়ান। আর মাঝে মাঝে দেখাশুনা করতে অনুরোধ করেছেন ঝুনুর বাপ-মাকে। সেই সূত্রেই ঘনিষ্ঠতা।

হীরেনের সঙ্গে এখন এদের সম্পর্ক খুব নিকট। বহু দূর নিকট হয়ে উঠেছে ঘন ঘন যাতায়াতে।

হীরেন ঘরে ঢুকেই বলে,—মাসীমা কোথা ?

সিনেমায়।

তুমি যাওনি ?

বাবার সঙ্গে মা সিনেমায় গেলে আমায় তো নেন না।

খুব ভাল। কিন্তু তার চেয়েও ভাল যে বেছে বেছে ঠিক সময়ে আমি হঠাৎ এসে পড়েছি। নয় কি ?

ঝুনুর মুখখানা রাঙা হয়ে ওঠে,—হাত গুনতে জানেন বুঝি ?

দেখি তোমার হাত দাও, দেখো বলতে পারি কিনা সব কথা।

বলে ঝুনুর হাতখানা ধরে কোলের কাছে আনে হীরেন।

ঝুনু হাতটা টেনে নেয়,—থাক্, দরকার নেই।

হীরেন গম্ভীর হয়ে বলে, দেখি কি বই পড়ছিলে ? এক গেলাস জল দেবে ? কটা বাজে দেখো তো ?

ঝুনু মুখ টিপে হাসে, এক সঙ্গে এত ফরমাস! এই নিন ইতিহাস। দেখুন! তারপর জল আনতে বলব। একটা একটা করে।

ইতিহাস বইটা উলটে পালটে দেখতে দেখতে বলে হীরেন, কোনটা পড়ছিলে ?

লর্ড কর্ণওয়ালিস্।

পারমানেন্ট্ সেটেলমেন্ট্ কাকে বলে বলতে পারবে ?

ধরুন যদি বলতে না পারি।

তবে মাসীমাকে বলে দেব কিছু পড়াশুনো করো না।

আমিও বলব হীরুদা এসে গল্প করে আমার পড়া নষ্ট করে দেন। দাঁড়ান, এবার জল আনতে বলি। লোটন!

লোটন ডাক শুনে ঘরে আসে।

এক গ্লাস্ জল নিয়ে এসো তো।

লোটন বেরিয়ে যায়।

এ ছেলেটা কেমন ?—শুধোয় হীরেন।

ঝুনু হীরেনের মনের চেহারাটা পরিষ্কার দেখতে পায় যেন, বলে,—খুব ভাল লাগে।

তাই নাকি ? হীরেন বাঁকা হাসে।

ঝুনু মনে মনে ভারি আনন্দ পায় হীরেনের কথায়,—এত সুন্দর কথা বলে ছেলেটি, আর ওবিডিয়েণ্ট। মানে যা বলি তাই শোনে মুখ বুঁজে। কত রাতে ঘুমোবার আগে ওর সঙ্গে বসে বসে গল্প করি।

হুঁ। তাহলে এদ্দিনে একটি সঙ্গী পেয়েছ।

সত্যি, ওর কাছে বসে ওর সঙ্গে কথা বলতে আমার এত ভাল লাগে!

হীরেন মনে মনে ভাবে, ও, তাই বোধহয় ছেলেটা 'বাবু নেই' বলে তাকে তাড়িয়ে দেবার মতলবে ছিল। এর মধ্যে যে এই গেঁয়ো ছেলেটার সঙ্গে এত জমে গেছে কে জানত।

হীরেন উঠে পড়ে,—খুব ভাল। ওর সঙ্গে বসে গল্প করো, মিছিমিছি আমার সঙ্গে গল্প করে তোমার যে সময় নষ্ট হল তার জন্যে মাপ চাইছি।

বলেই একটু অভিনয়ের ভঙ্গিতে হীরেন ঘর থেকে বেরোতে যায়। ঝুনু দাঁড়িয়ে উঠে বলে ওঠে,—শুনুন, কোথা যাচ্ছেন! শুনুন।

হীরেন ডাক শুনে ঘর থেকে বেরোবার বেগটা আরও বাড়িয়ে দেয়। লোটনও সেই মুখে আসছিল ঘরে। হীরেন ঝড়ের বেগে প্রস্থানের মুখে লোটনের সঙ্গে ধাক্কা লেগে এক গেলাস জল হীরেনের গায়ে ঢেলে পড়ে জামার পিছনটা আর একটা হাতা সমস্তটা ভিজে যায়। হীরেন কোন কথা না বলে দাঁড়ায়।

ঝুনু খিল-খিল করে হেসে ওঠে।

হীরেন লোটনের গালে কয়েকটি চড় মারে জোরে।

লোটনের মাথাটা ঝিম-ঝিম করতে থাকে।

• হীরেন বেরিয়ে যায়।

ঝুনু তখন হেসে লুটোপুটি খেতে থাকে। লোটন বসে পড়ে।

ঝুনু হাসতে হাসতে এগিয়ে আসে, লোটনের একখানা হাত ধরে বলে, —কিছু মনে কোরো না ভাই। খুব লেগেছে বুঝি?—বলে আবার হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ে।

লোটন নিচু হয়ে গ্লাসটা কুড়োয়।

জলটা মুছে নে লোটন।—এতক্ষণে বলে ঝুনু।

লোটন গ্লাসটা নিয়ে বাইরে যায়। হীরেনের বলিষ্ঠ হাতের চড় কটি ও বলেই তাই সইতে পেরেছে। অন্য কেউ হলে ঘুরে পড়ে যেত।

কিছুক্ষণ বসে থাকে বারান্দায়।

কি হলরে?—বাইরে এসে বলে ঝুনু।

মাথা ভার, ভেতর কি রকমটা কচ্ছে।—বলে লোটন।

ঝুনু ওর চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, সেরে যাবে। থাক্ তুই বোস, আমিই জল পুঁছে দিচ্ছি। আর শোন, মা-বাবাকে যেন বলিসনি হীরুদা আজ এসেছিল, বুঝলি? দুটো পয়সা দোব।

ঘাড় নেড়ে লোটন সম্মতি জানায়।

বেলা দেবী আপ্রাণ চেষ্টা করেন লোটনকে শিক্ষা দিতে, তাকে ভদ্রমানুষের মতো খানিকটা অন্তত গড়ে তুলতে। অভদ্রতা হ্যাংলাপনা নোংরামি এ সব চলবে না। কিছুতেই না। বেলা দেবী পণ করে নিয়েছেন। সভ্য জীবনের বাঁধাধরা ছকের ভেতর লোটনের জীবনের প্রতিটি দিনকে পুরে ফেলতে হবে। অবাধ্যতা অশিক্ষার কোন একটু আভাস পেলেই ক্ষেপে যান বেলা দেবী।

দেবকুমারবাবুর কলেজ খুলে যায়। কলেজ, টিউশানি আর পড়া এই নিয়েই সময় কাটে দেবকুমারবাবুর। এর ফাঁকে লোটনের দিকে চোখ দেবার অবসর আর তাঁর থাকে না। শুধু মাঝে মাঝে শুধোন,—কেমন লাগছে রে?

লোটন চুপ করে থাকে।

দেবকুমারবাবু আবার কাজে মনোযোগ দেন।

একদিন দেবকুমারবাবু বসে পড়তে পড়তে ডাকেন বেলা দেবীকে,—শুনছ, আমার খাতাখানা কোথায় গেল, যেটায় নোট করি সব? সেই যে নীল মলাট।

বেলা দেবী এখানে ওখানে খোঁজেন,—কোথা আবার যাবে? লোটন!

লোটন আসে।

একখানা খাতা দেখেছিস, নীল মলাট?

লোটন ঘাড় নাড়ে—না!

খুঁজতে খুঁজতে বেলা দেবী খাতাটি আবিষ্কার করেন দেবকুমারবাবুর কোল থেকে,—বেশ মানুষ, তোমার কোলেই তো খাতা।

হাসতে থাকেন বেলা দেবী। দেবকুমারবাবুও হেসে ফেলেন, তাই তো।

হঠাৎ জোরে হেসে ওঠে লোটন।

দেবকুমারবাবু পড়ায় মনোযোগ দেন।

লোটনকে বাইরে বারান্দায় এনে বেলা দেবী কানটা ধরেন,—অসভ্য কোথাকার!

লোটন কিছুই বুঝতে পারে না কি অন্যায়টা ও করল।

ঘরে অমন অসভ্যের মতো হেসে উঠলে কেন? আর হাসবে?

না।—ঘাড় নাড়ে লোটন। হাসাটা যে অন্যায় হয়ে গেছে এ কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। হবেও বা। হাসাও হয়তো অন্যায়। লোটন আর হাসবে না। হাসি-কান্নার সময়ও যে স্থান ও সময়ের হিসেব করে নিতে হয় তা কে জানত। কখন হাসলে ন্যায় কখন হাসলে অন্যায়—তাই বা কি করে বুঝবে লোটন। তার চেয়ে একেবারে না হাসাই ভাল।

কানটা জ্বালা করে লোটনের।

বেলা দেবী ওকে সভ্য করবার উৎসাহে দ্বিগুণ সতর্ক হয়ে ওঠেন। সর্বদাই লোটনের ওপর কড়া নজর। কখন কি বেফাঁস কিছু করে বসল।

দুদিন না যেতেই আবার এক কাণ্ড। বেলা তখন সাড়ে এগারোটা হবে। আজ আর সকালে স্নান হয়নি বেলা দেবীর। রান্না সেরে দেবকুমার

ঝবুকে কলেজে রওনা করে দিয়ে স্নান-ঘরে ঢোকেন। রান্না করতে এত গরম লাগছিল আজ। ভাপসা গরম পড়েছে, তার ওপর একটু মোটা মানুষ, প্রায় হাঁপিয়ে উঠেছেন বেলা দেবী। রান্নার জন্যে একটা লোক ঠিক না করলে আর চলছে না। মুশকিল হয়েছে ওঁকে নিয়ে। উনি আবার যার তার হাতের রান্না খেতে পারেন না। বেলা দেবী হাঁপিয়ে ওঠেন বিশেষ করে গরমের দিনে।

কলঘরে তাড়াতাড়ি ঢুকে গায়ে জল ঢালতে পারলে যেন বাঁচেন তিনি।

কিছুক্ষণ পর কলঘর থেকেই চেঁচিয়ে বলেন,—লোটন, আমার শাড়িটা এনে দে তো!

লোটন বাইরে এঁটো পরিষ্কার করছিল, এগুলো সবই ওর করতে হয়। কিই বা না করতে হয়। ভোঁরে উঠে ঘর-দোর মোছা, বাবুর সঙ্গে বাজারে যাওয়া, বাজার টেনে আনা। এসে কোন কোনদিন মাছ কোটা। দোকানে যাওয়া। বাবুর ঝুমুর জুতো পরিষ্কার করা, ওদের কাপড়-জামা মাঝে মাঝে ধোয়া, সাবান দেওয়া। তারপর খাওয়া সেরে বাসন মাজা, আবার একটু জিরিয়ে দোকান যাওয়া, জলখাবার দেয়া, আরও কত অগুন্তি ফরমাস। কলের পুতুলের মতো সব কাজই করে লোটন। শুধু মাঝে মাঝে ঘুম পায় আর মাথাটা ঘুরে ওঠে। সন্ধ্যায় যেদিন ওরা বেড়াতে বেরোয়, সেদিন শুধু লোটন একা-একা বসে থাকে জানালার কাছে। ভাববার সময় পায়। কিন্তু ভাবার ক্ষমতাও যেন লোপ পেতে চলেছে ওর। চিন্তার সুতোগুলি জড়িয়ে যায়। শুধু হাঁ করে তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ রাস্তার দিকে। কত মানুষ যায়, কাউকে ও চেনে না। অজানা পুরীতে এসে বন্দী হয়েছে যেন। ভয় করে। আবার তাকায় আকাশের দিকে। একটু ভাল লাগে। এইবার যেন ও ছোঁয়া পায় ওর গাঁয়ের। আকাশটা বদলায়নি। সেখানেও যেমন এখানেও তেমন। একটা স্বস্তির ভাব নেমে আসে ওর মনে।

—কইরে লোটন।

গিন্নিমার গলা শুনতে পাওয়া যায় আবার।

হাত ধুয়ে শাড়িখানা ঘর থেকে নিয়ে বেরিয়ে আসে লোটন।

এসে সোজা কলঘরের দরজাটা ঠেলে শাড়িখানা এগিয়ে দেয়। ভেতরে দেখে অবাক। বেলা দেবী গায়ের কাপড় খুলে মনের আনন্দে সাবান মাখছেন। লোটনকে কলঘরের দোর খুলতে দেখে উনিও কম বড় অবাক হন নি!

শাড়িটা ওর হাত থেকে টেনে নিয়েই দোরটা বন্ধ করে দেন।

একটু পরেই বেরিয়ে আসেন।

এসে লোটনের ঘাড়টা ধরে ঝাঁকানি দেন দুবার,—অসভ্য কোথাকার!

লোটন আরও একবার অবাক হয়।

উনি রাগে প্রায় কাঁপতে থাকেন। ওঁর সদ্যস্নাত মুখখানা রাঙা হয়ে ওঠে,—কেন দোর খুললি, বল?

লোটন একবার আত্মরক্ষার চেষ্টা করে বলে,—কাপড় চাইলে তো?

—চাইলে তো! আবার তুমি বলা হচ্ছে!

ঝাঁকানি দিয়ে বলেন,—আবার মুখে মুখে কথা। জানোয়ার! মেয়েছেলের সম্মান রাখতে শেখোনি রাস্কেল।

মেয়েছেলের সম্মান রাখার মানেটা যদিও লোটনের কাছে তখনও খুব পরিষ্কার হয় না, তবু মুখ বুজে চুপ করে থাকে। চোখের জল ওর ফুরিয়েই গেছে বুঝি। কাঁদে না ছেলেটা। শুধু বোবার মতো ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, কখনও কখনও বা মুখ নীচু করে। কিই বা বলবে। এদের কথাও সে ভাল বোঝে না। এরাও যেন ওর একটা কথা শুনলেই জ্বলে ওঠে। দিন দিন শুধু ওর দম আটকে আসে এই অসহ্য আবহাওয়ায়।

এতেই তো শেষ নয়। সন্ধ্যায় হীরেন বেড়াতে আসে আবার আজ। ঝুনুর পড়বার ঘরে প্রথম ঢোকে।

ঝুনু এবার চটেছে,—সেদিন যে বড় চলে গেলে?

—খুশি!—বলে হীরেন এ বই ও বই নাড়াচাড়া করে।

একথা সেকথার পর হীরেন বলে,—সে ছোঁড়াটা কোথা?

ঝুনু হেসে ফেলে,—সে যা আজ কাণ্ড করেছে।

তারপর কলঘরের বৃত্তান্ত সব বলে হীরেনের কাছে। হীরেন শুনে উথলে ওঠে।

বাইরে ভীষণ গম্ভীর হয়ে বলে,—ছিঃ ছিঃ! মাসীমা তো জানে না ও হাড় বদমাইস। দেখেই চিনেছি আমি—মিটমিটে ভান।

রান্নাঘরে গিয়ে একথা সেকথার পর বলে,—মাসীমা, কলঘরে আজ কি ব্যাপার একটা শুনলুম যেন—মানে—কি হয়েছিল?

বেলাদেবী স্মিত হেসে বলেন,—আর বোলো না, ছেলেটা একটু যদি সভ্যতা জানে! একেবারে গেঁয়ো ভূত।

সব শুনে হীরেন আরও গম্ভীর হয়,—কিন্তু একে তো উপযুক্ত শাসন করা উচিত।

কে করবে! উনি তো পড়া নিয়ে ব্যস্ত। তার ওপর ছেলেটার একটু দোষও দেখবেন না। আমি আবার মারধোর করতে পারি নে। ও আমার কেমন একটা দুর্বলতা বলতে পারো।

হীরেন বলে,—না, না আপনি পারবেন কেন? মানে মেশোমশাই যদি না পারেন তবে তো—। আচ্ছা, কোন গোলমাল করলে না হয় আমায় বলবেন, আমি তো মাঝে মাঝেই আসি।

বেলা দেবী হেসে বলেন,—তা মন্দ নয়। ওসব গেঁয়োগুলোকে একটু মার-ধোর না করলে আবার ঠিক হয় না। তোমার ওপরই না হয় ভার দেয়া যাবে। দেখো যদি ওকে মানুষ করতে পারো! তাতে ওরও মঙ্গল আমাদের মঙ্গল!

হীরেন ডাকে,—এই ছোঁড়া! ছোঁড়াটার নাম কি?

লোটন।—বলেন বেলা দেবী ঠোঁট উলটে।

বাবা! আবার নামের বহর তো খুব দেখছি—লোটন পায়রা। লোটন!—হাঁক দেয় হীরেন।

লোটন ঘরে বসে ছিল। বেরিয়ে আসে।

কলঘরের দোর খুলেছিলি কেন?—হীরেন শুধোয়!

লোটন নীরব।

বল কেন খুলেছিলি?

লোটন কথা বলে না, বা বলতে ভরসা পায় না। হীরেনের হঠাৎ এমন

রুদ্রমূর্তি কেন, লোটন তার কারণটা বোধকরি মনে মনে আন্দাজ করবার চেষ্টা করে।

হীরেন বেলা দেবীর দিকে তাকিয়ে বলে,—দেখেছেন কেমন ঘুগু!—বলে উঠে লোটনের চুল চেপে ধরে—বল, জবাব দে?

লোটন চুলগুলো ওর শক্ত মুঠো থেকে ছাড়াবার বৃথা চেষ্টা করতে থাকে।

হাঁটু দিয়ে পিঠে একটা গোঁতা মারে,—জবাব দে?

উঃ—করে কঁকিয়ে ওঠে ছেলেটা। হাঁটুর গুতোটা কাঁকালে বেশ জোরে লাগে।

চুলের মুঠো ছেড়ে দিয়ে বলে হীরেন,—আচ্ছা, আজ তোমায় ছেড়ে দিলুম। আবার ফের কিছু করে দেখো তুমি! আমার তুমি চেন না। মেসের কত ব্যাটাছেলেকে ঠাণ্ডা করে দিইছি।

লোটন ছাড়া পেয়ে যায় ওঘরে। গিয়ে কোমরটা চেপে ধরে বসে পড়ে! কোমরটার ভেতর তখনও টনটন করতে থাকে।

হীরেন এবার ঝুনুর পড়বার ঘরে আসে।

বলে,—কোনরকম বেয়াড়াপনা করলে বলে দেবে আমায়। মাসীমা এর ভার আমার ওপর দিয়েছেন।

কার ভার?

ওই তোমাদের লোটন পায়রার। ওর ঝুঁটি ছিঁড়ে গোলা পায়রা করে দোব দুদিনে।

হাসে হীরেন নিজের অপূর্ব রসিকতায়।

ছেলেটি কিন্তু খুব ভাল।—বলে ঝুনু।

হীরেনের মুখের হাসিটা বাঁকা হয়ে যায়,—কতটা ভাল করা যায় সেইটেই তো দেখব।

ঝুনু মুচকি হাসে,—আচ্ছা, তুমি যদি কোন অন্যায় করো তোমায় শাসন করবে কে?

কেন তুমি করবে নাকি?

ওরে বাবা!—ঝুনু বলে,—অত গুরুভার সইতে আমি পারব না। পরের বোঝা টেনে বেড়াবার মত বাজে সময়ও আমার নেই।

ছেলেটার সঙ্গে গল্প করবার মত বাজে সময় তো আছে?

সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

হীরেন কথাটাকে লঘু করবার জন্যে বলে,—আর আমার ব্যক্তিগত কথাটা মনে আছে তো?

কি?

কবে সিনেমায় যাবে?

না, ইস্কুল পালিয়ে সিনেমায় যাওয়া আমার ভাল লাগে না।

হঠাৎ এতো বৈরাগ্য এল কেন বলো তো?

এমন করে তো আর চিরকাল চলবে না।

নিশ্চয়ই না।—বলে হীরেন—ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতেই হবে। আপাতত ও সব ভাবনা মাথায় ঢুকল কেন?

ঝুনু গম্ভীর—ভাববার বয়েসটাও কি আমার হয় নি?

খুব হয়েছে। ষোলয় ষোল কঁলা পুর্ণ হয়ে গেছে,—এখন আর বাকি কি? দুজনে না হয় সেদিন সিনেমা থেকে কোন পার্কে গিয়ে বসে বসে ভবিষ্যৎ ভাবব। কবে যাবে বলো?

পরে জানাব। রাত হলে বাড়িতে কি বলব?

বলবে স্কুলে একটা ফাংশন ছিল, ব্যস্!

কিন্তু আমায় যে স্কুল থেকে আজকাল লোটন আনতে যায়।

সেদিন ওকে বলে যাবে, যেতে হবে না। দু আনা পয়সা দিয়ে দিও।

পয়সা কোথা পাব আবার!

এই নাও। বলে একটা টাকা বার করে দেয় হীরেন।

ঝুনু বলে,—থাক, ওটা তুমিই ওকে দিও—উত্তমমধ্যমের বদলে। ঠিক রইল শনিবার যাব।

তিনটের শোতে। কোথায়? এল্ফিন্স্টোনে?

না, এম্পায়ারে ?

না, তার চেয়ে কোন বাংলা ছবিতে চলো।

বেশ সে দেখা যাবে পরে। চললুম।

হীরেন বেরিয়ে যায়। যাবার সময় একটা হাঁক দেয়,—মাসীমা চললুম।

শনিবার স্কুলে যাবার পথে পই-পই করে বলে দিলে ঝুনু,—খবরদার, আজ আমাকে নিতে আসবিনে। মা শুধোলে বলবি স্কুলে গানবাজনা আছে। বুঝলি?

লোটন বই হাতে ঝনুর পিছন পিছন যাচ্ছিল।

একটু ভরসা পেয়ে বলে,—আমি গান শুনতে আসব না ?

না, এ গান খুব শক্ত। তুই ঠিক বুঝতে পারবি না।

হুঁ।—লোটন বলে,—ভাল ভাল যাত্তারার কত গান মুখে মুখে বলতে পারি।

ঝুনু মহা বিপদে পড়ে,—যা বলছি শোন। তোমাকে আজ একদম আসতে হবে না। যদি না আসিস তবে একটা জিনিস দোব।

না আসবার জন্যে আবার জিনিস দেবে কেন ?—লোটনের ব্যাপারটা কেমন কেমন ঠেকে,—বলে,—কি দেবে ?

একটা টাকা।

দাও।

কাল দোব।

লোটন আচ্ছা বলে মুখে, কিন্তু মনে মনে ঠিক ঠাওর করে উঠতে পারে না ব্যাপারটা কি। ওর একটু কৌতূহলও যে না হয় এমন নয়।

তবু আসবে না বলেই ঠিক করে। ঝুনুকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে ফিরে যায় বাসায়।

দুপুরে খাওয়া সেরে, বাসন মাজতে যায় লোটন। গিন্নিমা খেয়ে দেয়ে একখানি মোটা বই বুকের ওপর নিয়ে খাটের ওপর শুয়েছেন।

লোটন একা-একা বাসন মাজে। নির্জন দুপুরে নজর পড়ে ওর সামনে আলসের

ওপর দুটো পায়রার ওপর। পায়রা দুটো আলসের ছায়ায় গলা ফুলিয়ে বক্‌বকম্‌ করে যাচ্ছে। ভারী শান্তি ওদের চোখে। লোটন দেখে। হাতের বাসন মাজা থেমে যায়। কলঘরের দরজা দিয়ে তাকিয়ে থাকে আলসের দিকে! রজতশুভ্র রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের কোলে যে বাড়ির ছাদটা চোখে পড়ে তারই পাশে একটি বটগাছ। বটগাছটার দিকে তাকিয়ে লোটন নিমেষে চলে যায় ওদের গাঁয়ের বটগাছের কাছে। এমনি কত নির্জন দুপুরে ওরা বেড়িয়েছে খেত-খামারের ওপর দিয়ে। হাঁটতে হাঁটতে নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে জিরোতে বসেছে নন্দীপুরের বটগাছের নীচে। অনেক পাতা মেলে যেন দুহাতে ওদের ঢেকে রেখেছে সেই বিরাট বট। গায়ের ঘাম শুকিয়ে যায় হাওয়ায়। পাতার ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাসে আরামে চোখ বুজে আসে। মোটা শিকড়ের ওপর বসে ওরা। এরপর কোথায় যাওয়া যায়, তার কল্পনা করতে থাকে। হয়তো সেখান থেকে চলে তরমুজ-খেতের দিকে নদীর পাড়ে বালির চড়ার দিকে। তরমুজ চুরি করার কত কায়দা। বোঁটা ছিঁড়তে প্রাণান্ত, পায়ের আঙুল দিয়ে বোঁটা মোড়াতে মোড়াতে ছিঁড়তে হয়। হাত দিয়ে ছিঁড়তে গেলে যদি দূরে টুঙির ভেতর থেকে খেত-পাহারাদার সন্দেহ করে!

তারপর?

তরমুজ খাবার জন্যে যেতে হয় সেই ঘোষালদের বাঁশবাগানে। ওখানেই তো তাদের স্থায়ী আস্তানা। বাঁশবাগানের ভেতরে নিশ্চিন্তে বসে তরমুজ খাওয়া। কানে আসে বাঁশপাতার ঝিরঝিরে শব্দ আর ঝরা পাতার বৃষ্টি।

কিছুক্ষণের জন্যে যেন সম্পূর্ণ ডুবে যায় লোটন নিজের ভেতরের কল্পনায়।

পায়রা দুটো ডানা ঝাপটে উড়ে যায়!

লোটন চমকে ওঠে। বাসনটা নিয়ে আবার ছাই ঘসতে শুরু করে। চোখ দুটো ওর দৃষ্টিহীন হয়ে আসে, কেমন যেন বড় বড় ফ্যালফেলে হয়ে ওঠে।

মনটার যেন কোন সাড়াই পায় না সে কিছুক্ষণ। বাসন মাজা শেষ হয়ে

আসে। ওর মনে পড়ে আজ তো সুহৃদের স্কুলে গান আছে। গান শুনতে গেলে বড় ভাল হয়। হয়তো একটু সময় ভাল লাগতে পারে। দিনরাত এইটুকু জায়গায় থাকতে যেন কিছুতেই ভাল লাগে না।

ছ-মাইল খেতে খামারে, বনে ঝোপে, পুকুরে পাগারে ওর ঘর ছিল, সেই ঘর আজ তিন-কাঠায় এসে ঠেকেছে। কিছুতেই যেন আর নিজেকে এর ভেতরে গুঁজে দিতে পারে না, চেষ্টা করেও না। মনের মাপ ওর অনেক বড়, প্রাণের পরিধি অনেক বিরাট। শহরের চার দেয়ালের ভেতর তাকে জোর করে খাপ খাওয়াতে গিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে লোটন। তার ওপর সেই একই প্রশ্ন ঘুরে ঘুরে আসে সংসারের সবগুলো কোণ থেকে। তারা ছোটলোক, তারা গরীব। শুধু ঘৃণা আর নিপীড়ন পাবার জন্যেই তাদের জন্ম। এ কেমন করে হয়? ওর মনটা এমনই এক বিভিন্ন ছাঁচে গড়া, এমনই সহজ আগুনে ভরা যে সমাজের ওই চিরাচরিত নিয়মটাকে মেনে নিতে ওর কোথায় যেন বাধে। ঠিক মানে খুঁজে পায় না। গরম হয়ে ওঠে অকারণে। তবু তো সইতে হয়। হাত-পা বেঁধে সওয়ালে না সহ্য করে আর উপায় কি!

এর কি কোন উপায়ই নেই?

লোটন ভেবে কিছু বোঝে না। শুধু ওর সহজ মনে এইটুকুই বোঝে যে এ নিয়মের কোথায় যেন একটা মস্ত গলদ রয়েছে।

হীরেন যখন খুশি তার চুল চেপে ধরতে পারে, অথচ সে হীরেনের হুকুম অমান্য করতে পারে না। এ কেমন মজার ব্যাপার! কেন এমন হবে?

থাকত হীরেন তাদের গাঁয়ে! দেখত লোটন হীরেনের চুলে কতগুলো শুঁয়ো পোকা গাছের ওপর থেকে ছেড়ে দেয়া যায়! দেখা যেত একা অন্ধকারে বিলের ধারে গেলে কি করে ফিরে আসে।

বাসন মাজতে মাজতে বৃথা ক্ষোভে বুকখানা ভরে ওঠে ছেলেটার। চোখ দুটো জ্বালা করে। কান দুটো গরম হয়ে ওঠে। অস্থির হয়ে ওঠে যেন ও।

বাসন মেজে ভাবে, স্কুলেই যাওয়া যাক। গান-বাজনা যদি হয়, শুনলে হয়তো ভাল লাগতে পারে একটু সময়ের জন্যে।

স্কুলের দিকেই ও এগোয়।

শহরের পীচঢালা রাস্তা তখন প্রখর সূর্যের তেজে তেতে উঠেছে। পীচ গলে গেছে জায়গায় জায়গায়। লোটনের পায়ের নীচে গলা পীচ আঠার মতো আটকে যায়। তবু ও বিশেষ ভ্রূক্ষেপ করে না। দেশে কড়া রোদে আগুনের মতো গরম বালির ওপর দিয়েও চলে অভ্যেস আছে ওর। স্কুলের কাছে পৌঁছয় লোটন। ছুটি হতে বোধ হয় একটু দেরি আছে।

স্কুলের গেটের সামনে চাকরের আর ঝির ভিড়। দরওয়ান আর দু-চার খানা গাড়িও যে কোন কোন বড়লোকের মেয়ের বাড়ি থেকে আসেনি তা নয়।

লোটন তাদের ভেতরই গিয়ে দাঁড়ায়। শুধোয় এক চাকরকে—হ্যাগা, এখানে আজ নাচ-গান হবে?

না, না, কার কাছে শুনিথেলা? কিছু হবে নাই।—চাকর উড়ে। বাংলায় ওকে বোঝাবার চেষ্টা করে যে কিছুই হবে না।

তবে তো ভালই হল। ঝুনুকে নিয়ে বাড়ি যাওয়া যাবে।

ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়ে। শনিবারে ছুটির ঘণ্টা।

লোটন এদিক ওদিক তাকায়। মেয়েরা বেরোয় সরু গলায় চেঁচাতে চেঁচাতে—যেন কতকগুলি পাখির কিচিরমিচিরের মতো শুনতে লাগে।

লোটন দেখতে পায় বুকের কাছে বই নিয়ে ঝুনু আসছে। ঝুনুর চোখদুটো কিন্তু কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে।

লোটন ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার আগেই কোথা থেকে যেন ভূতের মতো আবির্ভূত হয় হীরেন্দ্রনাথ।

ঝুনুর চোখ দুটো খুশিতে নেচে ওঠে। হীরেনের কাছে আসে। লোটন থ মেরে যায়।

কি ভোজবাজি রে বাবা!

কিছু দূরে একখানা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে, তার ওপর ওরা চেপে বসে যায়। লোটন একবার ভাবে ডাকবে নাকি! কিন্তু ভরসা হয় না হীরেনের জন্যে। ও লোকটাকে বড় ভয় করে লোটন।

ট্যাক্সিওয়ালা ভঁক-ভঁক করতে করতে ওর নাকের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যায়।

কোথায় বা নাচ, কোথায় বা গান!

কথাগুলো সবই মিথ্যে বলেছিল ঝুনু এটা এতক্ষণে বুঝতে পারে লোটন। কিন্তু কারণটা ঠিক ঠাওর করতে পারে না।

কিছুক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে এগোয় ও বাড়ির দিকে। মিথ্যে কথাকে ও ছোট বেলা থেকে বড় ঘৃণা করে! ওর মনে পড়ে না যে কখনও ও মিছে কথা বলেছে কারো কাছে। লোটনের কাছে ওটা ভীতুর লক্ষণ। খুব ভীতু না হলে কেউ কখনও মিছে কথা বলে। কেনই বা বলবে!

ঝুনু বড্ড ভীতু নিশ্চয়ই। কিছুর একটা ভয়ে সে ওর কাছে মিছে কথা বলেছে।

যাকগে!

বাড়ি ঢুকে বারান্দায় পা দিতেই গিন্নিমা বলেন ওঘর থেকে,—দোরটা এমন খুলে রেখে কোথা গিয়েছিলি রে লোটন?

ইস্কুলে!—বলে লোটন।

গিন্নিমা মাদুরের ওপর এপাশ ওপাশ করে বলে,—ঝুনু এসেছে?

না।

কেন? আজ তো ছুটি হয়ে গেছে এতক্ষণে। তাছাড়া তুই তবে ইস্কুলে গিয়েছিলি কেন?

লোটন বলে,—গেছিনু তো তেনাকে আনতে, কিন্তু—।

কিন্তু কি রে? ঝুনুকে স্কুলে পেলি না?

মহা বিপদে পড়ে যায় লোটন। মিছে কথা বলা তো তার পক্ষে সম্ভব নয়।

কি হল, চুপ করে আছিস কেন?—উঠে বসেন বেলা দেবী একটু ব্যস্ত হয়ে।

লোটন বলে ফেলে,—বলেছিলেন তো নাচ-গান আছে ইস্কুলে কিন্তু দেখলুম তিনি বেরিয়ে গেলেন ওই হীরুবাবুপানা একজনের সঙ্গে।

হীরুবাবুপানা! সে কিরে!—বেলা দেবী চমকে ওঠেন।—তোকে কিছু বলেছে ঝুনু?

হ্যাঁ, গান-বাজনা আছে ইস্কুলে।

তাই বল। তবে আবার হীরুবাবুর কথা বলছিস কেন?

সে যে এলেন!

আবার বলে এল!—মহা মুশকিলে পড়ে যান বেলা দেবী,—বল কোথা গেছে ঠিক করে।

মটর গাড়ি করে গেল! হীরুবাবুও ছিল।

বেলা দেবী আর কথা বলেন না। কি একটা আন্দাজ করে ফেলেন। কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকেন।

বেলা দেবীর কণ্ঠস্বর শোনা যায়,—লোটন কয়লা ভেঙে উনুনটা ঠিক কর। বাবুর জলখাবার চা হবে।

বাবু তাহলে এসেছেন। দেবকুমারবাবু।

সন্ধ্যার একটু আগেই ফেরে ঝুনু তেমনি বুকের কাছে বই নিয়ে গুনগুন করে কি একটা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে।

পড়বার ঘরে ঢুকে বই রেখে একটু জোরে বলে,—লোটন মাকে বল আমার চা-জলখাবার দিতে।

লোটন কিছু বলবার আগেই বেলা দেবীর কণ্ঠস্বর শোনা যায়—ঝুনু শোন।

কি মা? যেন হাওয়ায় ফুর-ফুর করতে করতে ও ঘর থেকে এ ঘরে চলে আসে ঝুনু।

কোথায় গিয়েছিলে?—বেলা দেবীর গলার আওয়াজটা আরও চাপা মনে হয়।

দেবকুমারবাবু পাশে বসে খাতা দেখছিলেন। খাতা থেকে মুখ তুলে তাকান, কথা বলেন না। চিরকালই সংসারের কোন ব্যাপারে দেবকুমারবাবু নাক গলাতে চান না, বরং নির্ঝঞ্ঝাটে পড়াশুনো করতে ভালবাসেন। আবার শুধোন বেলা দেবী,—স্কুল থেকে কোথা গেছলে ?

ঝুনুর মুখটা শুকিয়ে যায়, কিন্তু জোর করে মুখে হাসি টেনে বলে,—কোথাও যাইনি তো! স্কুলে একটা একটা ফাংশন ছিল। তাই—। কেন লোটন বলেনি ?

হ্যাঁ বলেছে, কিন্তু তোমার কথার সঙ্গে তার কথা মিলছে না।

কিন্তু সত্যিই তো আমি গান শুনে এলুম।

সত্যি ?

সত্যি বলছি মা, এই তোমার গা ছুঁয়ে বলতে পারি। তুমি স্কুলে গিয়ে খোঁজ নাও না।

লোটন!—ডাকেন বেলা দেবী।

লোটন ঘরে ঢোকে।

ঝুনু স্কুল থেকে কোথা গিয়েছিল রে ?

লোটন বলে,—তা তো জানি না। হীরুবাবুকে দেখেছিলুম।

শুনলে ? বলেন বেলা দেবী।

ঝুনু প্রায় আকাশ থেকে পড়ে,—আরে যাস্! ও নিশ্চয়ই অন্য কাউকে দেখেছে!

বেলা দেবীর গলায় একটু ঝাঁজ পাওয়া যায়,—তুমিও তো মিছে কথা বলতে পারো ?

আমি।—ঝুনু হাত নেড়ে বোঝাতে থাকে,—কখনও তোমার কাছে মিছে কথা বলিচি। তাছাড়া বয়ে গেছে আমার মিছে কথা বলতে। বেশ তো হীরুদাকে ডেকে শুধিয়ো ?

আসামী হাজির হোক, তারপর বিচার কোরো।—বলেন দেবকুমার-বাবু।

বেলা দেবী বলেন,—তুমি চুপ করো তো!

দেবকুমারবাবু হাসেন,—ব্যাপারটার মীমাংসা তো খুব সোজা। এমনও তো হতে পারে যে ওরা কেউই মিছে কথা বলছে না। লোটন ভুল দেখেছে তাই সত্যি ভেবেই বলছে। ওরাও হয়তো কোথাও যায়নি তাই সত্যি বলছে। ভেবে নাও না এমনি একটা কিছু।

না। ভেবে নিতে পারব না। আসুক হীরু।

সেদিনকার মতো ব্যাপারটি ধামাচাপা পড়ে যায়। ঠিক দুদিনের মাথায় হীরু আসে বাড়িতে সন্ধ্যায়। ঝুনু যেন অপেক্ষাই করছিল। দরজাটা খুলেই হীরুর হাতে একখানা কাগজ গুঁজে দেয়। তাতে মোটামুটি লেখা আছে, সব চিচিং ফাঁক হয়ে গেছে। তুমি খবর্দার স্বীকার কোরো না স্কুলে গিয়েছিলে আমায় নিতে। আমিও স্বীকার করিনি। খুব সাবধানে কথা বোলো মায়ের সঙ্গে। কত বলি আর এত লুকোচুরি ভাল লাগে না। এতই যদি সাহস তবে আমাকে নিজের করে নিতে এত ভয় কেন? তোমার বাবা-মাকে রাজী করিয়ে আমার বাবাকে বললেই তো হয়। মা গররাজী হলেও বাবা রাজী হয়ে যাবেন! কিছুই এ সব করবে না কেন শুনতে পাই? কতদিন আর চোরের মতো লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াব? তার ওপর বাড়িতে আবার এখন এক আপদ এসে জুটেছে। যা ভাল বোঝ কোরো। আমার সবই তোমার। ইতি ঝুনু।

আরও কিছু উচ্ছ্বাস, আরও কিছু কাঁচা মনের রঙ-ধরা আবেগ ছিল চিঠিটিতে; বেলা দেবী যা স্বপ্নেতেও ভাবতে পারে না। সে সব কথার কিছু জানতে পারলে হয়তো তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়তেন 'শকে'। এমন নিয়মিত শাসনের ভেতরেও ঝুনু এত শিখে ফেলেছে!

বেলা দেবী কিছুই ভাগ্যিস জানেন না। হীরু পড়ল চিঠিখানা দরজা থেকে খানিকটা দূরে গিয়ে, তারপর সোজা রান্নাঘরের দিকে চলে এল,—মাসীমা, মাসীমা আছেন?

বেলা দেবী রান্নায় অতিরিক্ত মনোযোগ দেন, উত্তর দেন না।

মাসীমা, আজ কিন্তু বড় খিদে পেয়েছে।

বেশ তো খাবে!—খুব সংযত গম্ভীর স্বরে বলেন বেলা দেবী।

হীরেন একটু বেসামাল হয়ে পড়ে। নিজের দুর্বলতা ঢাকতে গিয়ে বেশী কথা বলে ফেলে,—মাসীমার কি অসুখ হয়েছে?

না।—রেকাবিটা নামিয়ে ফেলেন বেলা দেবী।

বলেন তেমনি গাম্ভীর্য বজায় রেখে,—ঝুমুর সঙ্গে শনিবার দিন কোথায় বেড়াতে গেলে? সব বলছিল?

হীরু যেন মানুষকে মাথা দিয়ে হাঁটতে দেখছে এমনি অবাক হয়ে বলে,—ঝুমু! কি বলছেন মাসীমা। শনিবার তো আমি কলকাতায়ই ছিলাম না। শুক্রবারই কলকাতার বাইরে এক বন্ধুর বাড়ি চলে গিয়েছিলুম।

কি জানি ঝুমু ওরা বলছিল, তুমি ঝুমুর সঙ্গে কত জায়গায় বেড়িয়ে এলে! যেন বেলা দেবী নিশ্চিতই জেনে ফেলেছেন যে ওরা গিয়েছিল এমনই একটা মুখের ভাব করেন বেলা দেবী। দেখা যাক্ তবু যদি হীরেন ধরা পড়ে।

কিন্তু হীরেন তো তার আগেই চিঠি পেয়ে বসে আছে, সটান বলে,—না, না, হতেই পারে না। কে আপনাকে এসব মিছে কথা বললে।

বারান্দায় লোটন ছিল, বেলা দেবী বলেন,—ওই তো ও বললে।

এতক্ষণে বেলা দেবীর যেন মনে হয় লোটনই মিছে কথা বলেছে। কিন্তু এমন একটা মিছে কথা বলার পেছনে লোটনের কোন মতলব নেই তো! মেয়ের নামে কলঙ্ক রটানো কম অপরাধ নয়? রাগটা গিয়ে লোটনের ওপরেই এবার বেশীটা পড়ে।

ঝুমুও ঘর থেকে বেরোয় এতক্ষণে—এই যে হীরুদা।

যেন এই মাত্র হীরুকে দেখল ঝুমু।

হীরেন লোটনের সামনে গিয়ে বলে,—তুই বলেছিস এমন জঘন্য মিছে কথা।

বেলা দেবী বলে ওঠেন,—আর বোলো না বাবা, এমন এক একটা কাণ্ড ছোঁড়াটা বাঁধাতে পারে—ছিঃ ছিঃ!

এ সব হাড় বদমাইস মাসীমা, যেমন মিথ্যুক তেমনি চোর। দেখবেন এরপর বাড়ি থেকে জিনিসপত্তর সরাতে শুরু করবে। এদের জাতই এই রকম।

বলে লোটনের দিকে তাকিয়ে বলে,—বল কেন বলেছিস?

লোটন অবাক, এ আবার কি হল! তবু মিথ্যে কথা সে বলল না। জোর করে বলে লোটন,—মিছে কথা আমি বলি না।

আলবত বলিস রাস্কেল।—বলে গোটা তিনেক চড় বসায় হীরেন।

না বলি না—গোঁ ধরে বলে লোটন।

আবার গোটা কতক চড়-কিল। ছেলেটার নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে পড়ে।

বেল দেবী রক্ত দেখে বলেন,—যাক বাবা, আর নয়।

লোটন বসে পড়ে। কাপড়খানার খুঁট দিয়ে নাকটা চেপে ধরে।

হীরেন রেগে প্রায় কাঁপতে কাঁপতে পড়বার ঘরের দিকে যায়। একটু পরেই সেখানে ঝুনু আসবে।

এই যে অত্যাচার! চুপ করেই সইতে হয়। ছেলেটা শুধু রোগা হয়ে যায় দিন দিন। ফ্যাকাসে পাণ্ডুর হয়ে ওঠে ওর মুখখানা। ততই যেন তেজ কমে আসে, যতই বিনা প্রতিবাদে সয়ে যায় সব ব্যবহার। মাঝে মাঝে শুধু ওর চোখে একটা অসহায় ভাব ফুটে ওঠে। কোথায় যেন জীবনের সুর হারিয়ে গেছে। শিশুমনে হাতড়ে খুঁজবার চেষ্টা করে, খুঁজে পায় না। মনে পড়ে শুধু আবছা আবছা মায়ের কান্নার কথা। বুকের ভেতরটা যেন মুচড়ে ওঠে। আর মনে পড়ে বড্ড বেশী সেই ঘন নিবিড় জংগলে ছায়াঘেরা ভাঙা মন্দিরে বুড়ো পাষাণটার কথা। ওটার জন্যে বড় কষ্ট হয়।

বোবার মতোই দিন কাটে। কান্না পাবার মতো স্নায়ুর শক্তিও আর নেই। সমস্ত অনুভূতিগুলো আড়ষ্ট হয়ে গেছে ভীষণ আতঙ্কে। ভয়ে যেন অন্ধকার দেখে ছেলেটা চারদিকে। মাথার ভেতর যেন চাকা ঘোরে সকাল সন্ধ্যায়, চোখ বুজে আসে, তবু খাটতে হয় মাকুর মতো। প্রথম প্রথম খিদেতে পেট জ্বলে যেত। এখন আর জ্বলে না। শুধু পেটে ঘা হলে যেমন মাঝে মাঝে চিনচিন

করে, তেমনি একটা যন্ত্রণা হয়েছে। অসহ্য যন্ত্রণা হয় পেটে। তবু কাঁদে না, পাছে কেউ টের পায়।

ছোটখাটো মাঝারি শিক্ষা দিতে দিতে লোটনকে মানুষ করবার চেষ্টার আর অবধি নেই বেলা দেবীর। একটা গেঁয়ো অভদ্র ছেলেকে মানুষ করে তোলবার মধ্যে একটা আত্মগর্বও যে তিনি অনুভব করেন না, এমন নয়। বেশ আরাম লাগে মাঝে মাঝে। মাঝে মাঝে ক্ষোভ করে বলেন স্বামীকে,—দেশে যে এমন কত ছেলেই আছে, না আছে শিক্ষা, না আছে রুচি, না আছে সভ্যতা। সাধে কি আর সায়েবরা বলে আমাদের অসভ্য জাত! এ সব ছেলেদের মানুষ করে তোলবার কোন ব্যবস্থাই কি নেই গো?

দেবকুমারবাবু বেলা দেবীর দিকে শুধু তাকান।

আবার হয়তো বলেন বেলা দেবী,—দেশটা উচ্ছন্নে গেল তো এই জন্যেই! কারুর যেন এদের মানুষ করবার আগ্রহ নেই।

অর্থাৎ বেলা দেবীর আগ্রহের আর সীমা নেই।

একটা স্কুল খোল না?—বলেন এবার দেবকুমারবাবু।

দায় পড়েছে। একটাকে নিয়ে জ্বলে গেলুম।

তবু রক্ষে। মুচকি হেসে বলেন দেবকুমারবাবু,—সবগুলিকে তোমার স্কুলে মানুষ করতে পাঠালে সব ডিস্‌পেপটিক বাবু হয়ে যাবে।

খোঁচাটায় জ্বলে ওঠেন বেলা দেবী,—অই তোমার আরম্ভ হল আমাকে বিঁধে কথা বলা।

গায়ে তোমার তাহলে এখনও বেঁধে। অনুভূতিটা ভেবেছিলাম হয়তো বা কালচারের ব্যাঙ্কে জমা রেখেছ!

মানে?

কিছু না।—দেবকুমারবাবু বইয়ে চোখ রাখেন।

আবার কোনদিন হয়তো বা বেলা দেবী বিকেলে বসে গল্প করছেন স্বামীর সঙ্গে। একটু সেজেছেন। ঝুনু হয়তো বা গেছে তার মামার বাড়ি। গরমের

শাড়িটি পরেছেন। পাউডার-স্নো মেখে চুলটি ফাঁপিয়ে বেঁধে, বেশ বড় আধলার মতো একটি সিঁদুরের টিপ পরে ঘরে চেয়ারে বসে গল্প করছেন দেবকুমারবাবুর সঙ্গে। দেবকুমারবাবু ইজিচেয়ারটায় বসে সামনে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ওঁর কথার কিছু শুনছেন, কিছু বা শুনছেন না।

হয়তো বললেন রেলা দেবী,—দেখো, তোমার ওই ভূত ছোঁড়াটা অনেকটা মানুষ হয়ে উঠেছে।

কই দেখে তো কিছু বুঝি না, শুধু একটু রোগা হয়েছে দেখি।—বলেন দেবকুমারবাবু।

দেখবে তবে?

কি দেখব?

দেখো, লোটন, এক গ্লাস জল নিয়ে এসো তো?

বলে চুপ করে একটু বসে থাকেন। লোটন এক গেলাস জল একটি রেকাবিতে ঢেকে সামনে এসে দাঁড়ায়। রেলা দেবী লোটনের দিকে তাকানও না। দেবকুমারবাবুর সঙ্গে গল্প জুড়ে দেন।

ফালতো গল্প, তার কোন বোনের ডেপুটি স্বামী কবে কোথায় বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল, সেখানে কত রকম পাথর পাওয়া যায়, আংটির পাথর, কানের টাবের পাথর। মাংস কত সস্তা। কপি কত আকারা। দেবকুমারবাবু একবার না হয় চলুক না সেখানে বেড়াতে।

দেবকুমারবাবু লোটনের দিকে তাকিয়ে একটা হাই তুলে বললেন,—এর পর চেঞ্জে গেলে তোমার দরজায় ঢোকাই সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। খুব রোগা তো দেখছি না তোমায়।

নজর দিলে তো অমনি। শীলাই বা আমার চেয়ে কি এমন রোগা? তোমরা কি খুব রোগা পছন্দ কর, না মোটা।

লোটন নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে।

দেবকুমারবাবু লোটনের দিকে তাকিয়ে আর একটা হাই তোলেন।

বলো না গো —ভ্রূক্ষেপ নেই বেলা দেবীর! লোটনের উপস্থিতিটা যেন জোর করে উড়িয়ে দিতে চাইছেন, তোমার কেমন পছন্দ? নিশ্চয়ই রোগা। আর যখন রোগা ছিলুম?

দেবকুমারবাবুর তরফ থেকে জবাব না পেয়ে নিজেই বলেন, রোগা যখন ছিলুম, তখন মোটা পছন্দ হত। তোমাদের মন পাওয়া ভার। রবি ঠাকুরের সেই কবিতাটা মনে আছে,—'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।' ঠিক সেই দশা তোমাদের। মিনিট পনেরো অনর্গল কথা বলে যাবার পর বেলা দেবী যেন লোটনকে হঠাৎ দেখে বলেন,—অ! টেবিলের ওপর গেলাস রেখে চলে যাও।

লোটন নিঃশব্দে টেবিলের ওপর গেলাস রেখে চলে যায়।

বেলাদেবী এক গাল হেসে বলেন,—দেখলে, কত ভদ্র হয়েছে। যতক্ষণ বলিনি, ততক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল, ডিস্‌টার্ব করেনি।

দেবকুমারবাবু হো হো করে হেসে ফেলেন।

ওকি, অত হাসবার কি হল?

না, ভাবছিলাম, এই দেখাবার কথা বলছিলে। অবশ্য দেখাবার মতো জিনিস বটে! বেশ কলের পুতুল করে তুলেছ ছেলেটাকে।

কলের পুতুল মানে?

মানে কানে হাসির কথাই ঢুকুক, কাঁদবার কথাই ঢুকুক, তার ঠোঁট ফাঁক হবে না। কলে চাবি দেয়া মাফিক কাজটি করে যাবে। নাঃ! ওকে দেশে ফেরত না পাঠালে আর চলবে না।

বেলা দেবী বলেন,—মনিবের সামনে হো হো করে হাসা, বকবক করে বকা—সেটা বুঝি খুব ভাল?

ভাল কি খারাপ জানিনে, তবে প্রাণের পরিচয় মেলে।

কেন, ওর প্রাণটা নেই কোথায়, বেশ তো নড়ছে, চড়ছে, নিশ্বাস ফেলছে। ওকি মরা?

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যান দেবকুমারবাবু—মরার মতোই তো দেখলাম।

হাত-পা নাড়লেই, নিশ্বাস ফেললেই কি প্রাণ আছে বুঝতে হবে! তুমি আমার কথা ঠিক বোঝনি!

আমি কোন কালেই কিছু বুঝি না! চিরটা কালই আমায় বোকা বানিয়ে রাখলে তুমি, কই আর তো কেউ এমন কথা বলে না। বাবা-মা থেকে শুরু করে নিজের মেয়েও তো এমন অপবাদ দেয় না। তোমার এত বুদ্ধির অহংকার কিসের শুনি?

আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করছিনে বেলা!

ঝগড়া করলেও তো বাঁচতুম। বুঝতুম তোমারও প্রাণ আছে। চুপ করে থাক বলেই তো আরও জ্বালা আমার। তোমার চেয়ে মরা মানুষ আর কোথায় দেখাবে? মানুষের জীবনে কত সাধ থাকে! দুজনে একটু বেড়াতে যাওয়া, দুদণ্ড খুশী হয়ে আলাপ করা, একটু ভালবাসা, একটু সহানুভূতি, কি আছে তোমার, কি দিয়েছ?

সবই আছে, কিন্তু আদায় না করতে পারলে কি দোষ আমার?

আদায় কি মেরে করতে হবে।

ছি! ছি! দেবকুমারবাবু লজ্জিত হন বেলা দেবীর ব্যবহারে। এই ব্যবহারের পর কোন স্বামীর প্রাণ থাকা কি সম্ভব? প্রশ্ন করতে চাইলেও করেন না দেবকুমারবাবু। নীরবেই থাকেন।

মারামারি করবার শিক্ষা আমার বাপ-মা আমায় দেয়নি। কণ্ঠে জ্বালা নিয়ে বলেন বেলা দেবী,—আজ পর্যন্ত বোকা, মূর্খ বলে ভেবেছ, মানুষ বলেও বোধ হয় ভাবোনি আমাকে! লজ্জা হওয়া উচিত তোমার!

চোখ ছলছল করে ওঠে বেলা দেবীর।

দেবকুমারবাবু জানেন, এর পর কোন কথা বলতে যাওয়া মানে আরও বিপদ ডেকে আনা। চুপ করেই থাকেন।

শুধু একবার বলতে চেষ্টা করেন মিষ্টি করে,—কি বলেছি আমি তোমাকে, অত চটছ কেন? বলে হাতটা ধরতে যান।

সরে এসে বলেন বেলা দেবী,—থাক, খুব হয়েছে!

বলে উঠে বাইরে চলে আসেন।

দেবকুমারবাবু একখানা বই খুলে বসেন। এমন তো মাঝে মাঝে হয়েই থাকে।

দিনের পর দিন কাটে, ঝুমুর জন্মদিন এসে পড়ে, জন্মদিনটি এবার একটু জঁাক করে করবার শখ বেলা দেবীর। গোপনে স্বামীর সঙ্গে আলাপও করে রেখেছেন। দেবকুমারবাবু বলেছেন,—আমারও তো শখ হয়, কিন্তু টাকা কই ?

সে ভাবনা আমার। এবারে আই-এর খাতা দেখে যা পেয়েছ, সেটা ধরে রেখে দিয়েছি। তাতেই হয়ে যাবে, তোমার কলেজের বন্ধুরা আসবে, শীলা ওর বর আসবে। আমার বন্ধু আসবে জনকয়েক, ঝুমুর বন্ধু কয়েকজন, আর বাবা, মা, ভাই দুজন, এই তো, আর আসবার কে আছে। ওই টাকাতেই হয়ে যাবে।

পারবে ?

বেলা দেবী হাসলেন। সংসারে স্বামীটি যে তার কত অসহায় বেলা দেবী জানেন। দেবকুমারের কপালে একখানা হাত রেখে বলেন, কিছু ভেব না। এটুকু না পারলে আর এতকাল তোমার নিয়ে ঘর করলুম কি করে বল তো ? বেশী কিছু তো আইটেম থাকবে না। মাংসের চপ্, ফ্রাই, দুখানা করে, রাধাবল্লভী দুখানা, চার টুকরো মাংস, দুটুকরো আলুর ঝোল, সন্দেশ দুটো, দুটো ছানার জিলিপী, ব্যস্। ডিশ তো আমাদের দু ডজন আছে, মনে নেই সেই বিয়েতে উপহার দিয়েছিল ভাইয়ের বন্ধুরা। তোমার কি করে মনে থাকবে। আজকের কথা তো নয়! সাতাশ বছর আগের কথা।

দেবকুমারবাবু নীরব।

তাহলে তোমার মত রইল।

এতে তো আমার খুব ভালই লাগবে! বলে দেবকুমারবাবু পাশ ফিরে শুয়ে পড়েন।

বেলা দেবী যোগাড় আরম্ভ করেন পরদিন থেকেই। সামনের বৃহস্পতিবার এগারোই জন্মদিন। নিমন্ত্রণের ভার নেন বেলা দেবী। চায়ের নিমন্ত্রণ সন্ধ্যায়।

দেবকুমারবাবুর কলেজের প্রফেসারদের বাড়িতেও বেলা দেবী স্বামীর সঙ্গে নিজেই যান। হাত জোড় করে বলেন মিষ্টি হেসে,—দয়া করে যাবেন। নইলে বড়ই নিরাশ হব।

নিশ্চয়ই যাব।—সবাই-ই বলেন—আপনি স্বয়ং এসেছেন!

স্বামীকে নিয়ে আবার ট্যাক্সিতে উঠে আর এক প্রফেসারের বাড়ির দিকে চলেন।

দুদিনে নিমন্ত্রণ শেষ করেন। ঝুনুকেও বলেন,—তোমার বান্ধবীদের নিমন্ত্রণ কোরো। হীরুকেও বোলো।

হীরেনকে বলবার ভারটা বেলা দেবী ঝুনুর উপরেই দেন।

ছেলেটি ভাল, ঝুনু যদি একটু বেশী মেলামেশা করে দোষ কি! সদরওলা বাপ। পয়সাও যথেষ্ট আছে। সম্পর্কটা খুবই দূরের, বিয়ে আটকায় না। মন্দ কি।

সেদিনে স্কুলের ব্যাপারের পর থেকেই একটা এমন মতান্তর তাঁর দেখা দিয়েছে এবং সেটিকে তিনি সযত্নে গোপনে মনে পুষছেন, স্বামীকেও বলেননি।

ঝুনু ঘাড় নেড়ে জানায় আচ্ছা।

ও ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, সেদিনের স্কুলের ব্যাপারের পরও মা হীরেনকে নিমন্ত্রণ করার ভার তার ওপর কেন ফেলে দিলে! মাঝে মাঝে ও ঠিক ঐ উল্টোটাই আন্দাজ করে যে বোধহয় মা তার ওপর রাগ করেই একথা বললে। অথবা তাকে একটু খোঁচা দেওয়াই মায়ের উদ্দেশ্য। খোঁচাটুকু নীরবেই হজম করে, যেতে হবে। তারও তো বয়স হয়েছে, সে সব বোঝে। লোটনের জন্যেই আজ তার কথাটা শুনতে হল। বার বার বারণ করা সত্ত্বেও লোটন কেন যে সেদিন স্কুলে গেল! লোটনের কি সত্যিই কোন উদ্দেশ্য আছে? মানে হীরেন যা মনে করে লোটনের ওপর রুষ্ট, তেমন কোন উদ্দেশ্য? কিন্তু কই তেমন কোনও আভাস তো কখনও পায়নি।

ওটা হীরেনের মনের বিকার বলেই ভেবে নিয়েছে এতদিন ঝুনু। সত্যিই কি তাই! কিন্তু ওই বাচ্চা ছেলে, ছোটলোক একটা চাকর, কতবড় সাহস

ছোঁড়াটার! ধরে চাবুক মারলে তবে এসব ইতর ছেলের শিক্ষা হয়। সব রাগটা গিয়ে পড়ে লোটনের ওপর।

শনিবার হীরেন আসে। এর আগেই ঝুনু ওর জন আষ্টেক বান্ধবীকে নিমন্ত্রণ করে আসে। ওদের ভেতর আবার লীলা নাচবে, অরুন্ধতী গান গাইবে, মাকে এসে বলছে ঝুনু। বেলা দেবী ভারী খুশী! বেশ তো নাচবে গাইবে—বেশ কথা! কিন্তু ঘুঙুর? লীলাই বাড়ি থেকে আনবে বলেছে। পরে আবার পৌঁছে দিতে হবে। বারান্দায় একটা কার্পেট পাতবার ব্যবস্থাও করতে হয় বেলা দেবীকে। নাচ-গান তো হবেই। ঝুনুর আপত্তি হবে একটু বড় জায়গা না হলে চলে কি করে!

হীরেন আসতেই ঝুনু বলে,—সামনের বেস্পতিবার খবর্দার আমাদের বাড়ি আসবে না।

কেন?

ভীষণ ব্যাপার।

কি আবার হল? মেয়ে দেখতে আসবে কেউ?

ঝুনু মুখ টিপে হাসে, ঠিক জায়গায় ঘা'টি অমনি বেরিয়ে পড়েছে,—এমনি আশ্চর্য এই পুরুষ মানুষের মন, মনটা ওদের যেন পুতুলনাচের মতো। সুতো মেয়েদের হাতে। একটু নাচালেই নাচবে। সুতোর টান পড়লেই ছটফট।

ঝুনু বলে,—আসবেই তো? চিরকালই কি এমনি কাটবে নাকি?

অ।—গম্ভীর হয়ে যায় হীরেনের মুখ। জোর করে মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করে বলে হীরেন,—বেশ তো! ভাবী বরটি কেমন?

খুব সুন্দর।

তবে তো খুব আনন্দের কথা। কি করে?

আমার চাকরি করবে।

সেটা তো আজীবন। এমনি কি করে?

বিশেষ কিছুই না। বক্সিং টক্সিং লড়ে, খুব গায়ে জোর।

হীরেনের মুখ শুকিয়ে যায়।

আমাদের কথাটাও তাকে বলব। তোমার কথাটা বলব। কিন্তু যদি রেগে মেরে বসে? মানে খুব গায়ের জোর কিনা!—ঝুনুর খুব হাসি পায় বলতে বলতে।

হীরেন বলে,—না, বলবার কি দরকার। আর তাছাড়া তোমার সঙ্গে আমার আর তেমন কি!

ঝুনু খিলখিল করে হাসে,—মারামারি করে পারবে তার সঙ্গে?

মারামারি করতে যাব কেন?—হাসচ কেন অত?

তোমার মুখ দেখে। মুখটা তোমার সত্যি—।

কি?

ভারি বোকা-বোকা দেখাচ্ছে!

হুঁ। গুম হয়ে যায় হীরেন।

ঝুনু মুখে আঁচল চাপা দিয়ে খুব হেসে নেয় একচোট। তারপর বলে—শোন। বেস্পতিবার আমাদের বাড়ি আসা চাই।

কেন? আমার আসার কি দরকার?

না, তোমার আসা চাই!

ব্যাপারটা কি বল তো? অত হাসছ কেন?—হীরেন যেন এতক্ষণে কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছে।

ব্যাপারটা আমারই, তুমি না এলে মায়ের মনে খুব কষ্ট হবে। আমার জন্মদিন।

হীরেন এতক্ষণে ভাল করে নিশ্বাস ফেলতে পারে,—তোমার জন্মদিন? না এলে তোমার মায়ের মনে কষ্ট হবে? আর তোমার মনে—?

আমার?

হ্যাঁ, তোমার?

ঝুনু একটু চুপ করে কি ভাবে, তারপর বলে,—জানি না।

বলতেই হবে, আমি না এলে তোমার মনে কি হবে? নইলে আসব না।

কি করে জানব!—কর্ণমূল আরক্তিম হয়ে ওঠে ঝুনুর—অত বুঝিনে আমি।

তবু হীরেনের জিদ,—বলবে না?

কি বলব। বলছি তো আমি এসব বলতে পারি না।

ঘরে ইতিমধ্যে ঢোকেন বেলা দেবী।—এই যে হীরু, কখন এলি ?

এই একটু আগে মাসীমা।

ঝুনুর দিকে তাকিয়ে বলেন বেলা দেবী,—নেমন্তন্ন করেছিস ?

হ্যাঁ, মা, হীরুদা বলছে আসতে পারবে না, ভীষণ ব্যস্ত সেদিন।

হীরেন কিছু বলবার আগেই বেলা দেবী বলেন,—না, না, তা হয় না, তোমাকে আসতেই হবে। তুমি না এলে দেখাশুনা করবে কে ? জান তো তোমার মেসোকে, বই মুখে তুললে আর মুখ থেকে বই নামবে না। তা মাথায় আকাশ ভেঙেই পড়ুক আর পৃথিবী উলটে যাক। তুমি আসবে ধর এই আড়াইটে নাগাদ।

হীরেন স্মিত হেসে বলে,—আজ্ঞে হ্যাঁ, আসব।

তা হলে দুপুরে ঠিক এস বাবা। আমি একা মানুষ, তাছাড়া নিমন্ত্রিতও অনেক।

হীরেন আবার ঘাড় নাড়ে।

বেলা দেবী ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

হীরেন বলে ঝুনুকে,—বেশ যা হোক, নেমন্তন্নটা আর একটু হলেই কাঁচিয়ে দিচ্ছিলে।

আর তুমি দুপুর থেকে জ্বালাতে আসবে তো ?

কাকে জ্বালাতে ?

কাকে আর জ্বালাতে পার। সত্যি আমার ভীষণ অসহ্য লাগছে। মা আজকাল বেশ একটু ইঙ্গিত করে কথা বলেন, যেন একটু খোঁচা দিয়ে।

কেমন ?

অত কথা বলতে পারি না। এই তো কালই বলছিলেন, হীরুকে তুই নিজে বলবি। মানেটা তো জলের মতো পরিষ্কার! আমাকে বিশেষ নিমন্ত্রণ করতে বলা কেন, আমি কি বুঝিনে ?

কি বুঝলে ?

• ওই লোটনই তো সব নষ্টের গোড়া। স্কুলের ব্যাপারটার পর থেকেই তো মা একটু বিদ্বেষ ভাবে কথা বলেন তোমার সম্বন্ধে।

হীরেন গম্ভীর হয়ে যায়,—হুঁ।

তোমার সবেতেই হুঁ। আমি তো আর পারিনে।

হীরেন বলে,—অত ব্যস্ত হয়ো না। বাবাকে চিঠি লিখেছি, উত্তর পেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। জান তো বাবার সঙ্গে আমার সব ব্যাপারেই খোলাখুলি কথা হয়।

লিখেছ ?

হীরেন চুপ করে থাকে, যেন চিন্তিত।

অত ভাবছ কি ?—ঝুনু একটু ভয় পেয়ে যায়।

ভাবছি,—দাঁত ঘসে বলে হীরেন,—এ লোটন ছেলেটাকে কি করা যায় !

ও ঠিক হয়ে যাবে। শোন, তুমি আমার জন্মদিনে কি দেবে ?

হীরেন চুপ করে থাকে গম্ভীর হয়ে।

বল না,—আবদার ঝুনুর।

কি চাও ?

কি চাইনে আগে ভেবে দেখতে দাও।

তবে তুমি ভাব, আমি মাসীমার কাছ থেকে আসি।

বলে বেরিয়ে যায় হীরেন। লোটনের কথাটা শোনা অব্দি হীরেনের মনটা জ্বালা করতে থাকে ছেলেটার স্পর্ধায়। মনে রাগ থাকায় ঝুনুর মিষ্টি কথা-গুলোও ওর ভাল লাগে না। ঝুনুর সঙ্গে তার সম্বন্ধটা নিবিড় হয় তো বা একদিন হবেই হবে কিন্তু আপাতত অবাধ মেলামেশায় যে ভাবে বাদ সাধছে এই একফোঁটা ছোঁড়া—তাতে রাগ না হয়ে কারই বা পারে ! দেখা যাক, সুযোগ মিললে হয়, এমন শিক্ষা হীরেন ওকে দেবে যে জন্মে ভুলবে না !

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বেলা দেবী সাবধান করতে থাকেন লোটনকে—খবদ্দার, গেঁয়োমি করবিনে।

লোটন আসবার পর দুটো হাফ প্যান্ট আর দুটো শার্ট দেবকুমারবাবু কিনে দিয়েছিলেন, সেই দুটো আনতে বলেন বেলা দেবী—লোটন নিয়ে আসে।

ওমা, কি নোংরা! তোকে বলেছিলাম না একটা জামা একটা প্যান্ট সর্বদা তুলে রাখবি।

লোটন চুপ করে থাকে।

যা উজবুক। হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। এক্ষুনি গিয়ে কেচে নিয়ে আয়! ভাল করে পরিষ্কার করবি, একটুও যেন না ময়লা থাকে। কত লোক আসবে!

লোটন কাচতে যায় কথামতো।

বাজার এসে যায় মুটের মাথায়।

বাজার তুলতে তুলতে এটা ওটা কত ফরমাশ করতে থাকেন বেলা দেবী। লোটনের নিশ্বাস ফেলবার ফুরসত নেই।

উনুনের ধারে ঠাকুর এসেছে, সেখানে নজর রাখতে হবে, বেলাদেবীর হুকুম।

আবার হয়তো বলেন,—এই দেখো, আদা আনেনি তো। যা লোটন, চট করে আদা নিয়ে আয়।

যাই।

লোটন আট আনার আদা আনতে যায়।

ফিরে আসতেই বেলা দেবী বলেন,—কোথা গেছিলি? তোকে যে বললুম ঠাকুরের দিকে নজর রাখতে!

আদা আনতে বললেন যে!

বেলা দেবী ধমকে ওঠেন—বললুম, বেশ করলুম তাই বলে ঠাকুরদের ওখানে একজন কাউকে থাকতে বলে যাবি তো।

লোটন হতবাক। এই এক কথা, পরমুহূর্তে আর-এক কথা।

খাটতে খাটতে বেচারীর জীবন বেরিয়ে যাবার দশা। বেলা দুটো বাজতে চলল, এখনও পর্যন্ত খেতে পায়নি! মাথাটা ঝিম-ঝিম করতে থাকে! তবু খেতে আজ তো একটু বেলা হবেই। কাজেই কিছু বলে না কাউকে।

আবার ডজন-ডজন গ্লাস ধোওয়া, সাজিয়ে রাখা, কত কাজ।

কাজের ফাঁকে আবার নজরে পড়ে, হীরেন এসে হাজির বেলা দুটোর পর।

এক গ্লাস জল দে দিকি?

কিরে চেয়ারগুলো ঠিক করে পাতিসনি?

না, কার্পেটটা একটু টেনে নিতে বললুম তখন থেকে রাস্কেল!

কোনটা ফেলে কোনটা করবে লোটন বুঝে উঠতে পারে না। চরকির মতো ঘোরে।

আবার ডাকেন বেলা দেবী,—লোটন!

লোটন হাজির।

বাক্স থেকে ডিশ বেরোয়, কাঁচের ডিশ। দু ডজন।

বেলা দেবী বলেন,—খুব সাবধানে এগুলো কলতলায় নিয়ে যা। সাবান দিয়ে এক-একখানা করে ধুয়ে নিয়ে আয়। দেখিস, ভাঙে না যেন। খবদ্দার।

কাঁচের ডিশগুলো নিয়ে কলতলায় যেতে হয় আবার!

ইচ্ছে করেই এবার একটু আস্তে আস্তে ডিশগুলো ধুতে থাকে,—যাতে দেরি হয়। ডিশগুলো তাড়াতাড়ি ধুয়ে নিয়ে গেলেই তো পরের কাজ ওর জন্যে তৈরী হয়েই আছে। খুব আস্তে আস্তে এক-একখানা ডিশে দুমিনিট ধরে সাবান মাখায়। এতক্ষণে যদি ভাতটা হয়ে গিয়ে থাকে, তবে ডিশগুলো ধুয়ে নিয়েই খেতে বসে পড়বে।

ডিশ ধুতে ধুতে হঠাৎ ওর নজরে পড়ে চৌবাচ্চার পাশে চিকচিকে একটা কি যেন দেখা যাচ্ছে। হাতে তুলে নেয়। কানবালা। গিন্নিমার কানবালা। এত কাজের ঝোঁকে স্নান করতে এসে হয়তো কোন কারণে খুলেছিলেন, আর পরবার কথা মনে নেই।

কানবালা দুটো তুলে নিয়ে ট্যাঁকে গোঁজে। আবার ডিশ ধুতে থাকে। ডিশগুলো রেখে গিন্নিমাকে দিয়ে দিলেই হবে।

ডিশগুলো সব ধোয়া শেষ করে অতি সাবধানে দুহাতে ধরে বেরোয়। একখানা ডিশ ভাঙলে তার যে আজ মাথা ভাঙবে এতে আর সন্দেহ নেই।

অতি সাবধানে ডিশগুলো নিয়ে এগোয়। এগুলো রেখে খেতে যাবে।

ঝুনুর পাতে বোধ হয় মাছ-টাছ কিছু আছে, সেগুলো খেতে হবে বেলা দেবীর হুকুমে। আর কারও পাতে যদি কিছু থাকে, তবে তাও খেতে হবে! ফেলা চলবে না। হয়তো বা পাত-কুড়োনো খেতে খেতেই পেট ভরে যাবে।

ভাবতে ভাবতে ঘরে ঢোকবার মুখে দরজার চৌকাটে পা আটকে ডিশগুলো নিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে যায় লোটন, ঝম-ঝম শব্দে প্রায় খানছয়েক ডিশ টুকরো টুকরো হয়ে যায়। শব্দ শুনে বেলা দেবী, ঝুনু, হীরেন সবাই এগিয়ে আসে।

লোটন চোখে অন্ধকার দেখে। উপুড হয়ে পড়ে থাকে।

হীরেন এসেই ওর কান দুটো চেপে ধরে। ধরে দু-তিনটে ঝাঁকানি দিয়ে ওঠায়! হীরেনের জোর ঝাঁকানিতে লোটনের ট্যাঁক থেকে ঝন করে মাটিতে পড়ে যায় কানবালাজোড়া।

কানবালা! ছোঁড়াটার ট্যাঁকে!

বেলা দেবী রাগে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বললেন,—তাই তো ভাবছি তখন থেকে, আমার কানবালাজোডা গেল কোথা! কি করে জানব যে বাড়িতে চোর পুষছি।

হীরেনের দিকে তাকিয়ে বলেন—তখনই তোমার মেসোকে বললুম কোথাকার একটা জানোয়ার ধরে আনলে! চোর কি ছ্যাঁচোড় কে জানে। আরও কত কি সরিয়েছে তাই বা কে জানে! আমরা তো গয়নাপত্র টাকা সবই বাইরে পড়ে থাকে।

লোটনের মাথাটা ফাঁকা মনে হয়, এত কথা কিছুই যেন ওর মাথায় ঢোকে না। খিদেয় আর খাটুনিতে ও যেন টলতে থাকে। কান দুটো দিয়ে আর মাথার তালু দিয়ে আগুন বেরোয়।

ঠাকুর ঝি সব এগিয়ে আসে।

হীরেন কানটা ছেড়ে দিয়ে লুচি বেলবার মোটা কাঠিটা টেনে নেয় ঠাকুরের হাত থেকে। তারপর আর কোন কথা না বলে ছপাছপ ছেলেটার পিঠে বুকে পেটাতে থাকে।

দু-বার উঃ-আঃ করে শুয়ে পড়ে ছেলেটা।

তার ওপরই হীরেনের মার চলে।

এক-একটা ছড়ির ঘা যেন মাথার ভেতর পর্যন্ত ঝাঁকানি দেয় লোটনের।

হীরেন বলে ওঠে,—দেখছেন কেমন হাড়পাকা চোর। মার খেয়ে কাঁদে না। চুরি করা তোর জন্মের মতো ঘুচিয়ে দোব।

ছড়ির শপাশপ আওয়াজ শোনা যায়।

লোটনের মুখে শুধু অস্ফুট আওয়াজ শোনা যায়,—মা—মা—। ঠোঁট দুটো ফাঁক হয় একটু।

মুখ দিয়ে ফেনা গড়াতে থাকে।

বেলা দেবী এবার থামান হীরেনকে,—থাক আর দরকার নেই।

হীরেন থামে।

কিন্তু ওকে তো নেমন্তন্ন-বাড়িতে আর রাখতে পারব না। কার কি চুরি করে বসবে! লজ্জায় ঘেন্নায় মরে যাব!

হীরেন বলে,—কোন ঘরে বেঁধে আটকে রাখুন না।

ওই কয়লা রাখবার ছোট ঘরটা আছে শুধু,—ঝুনু বলে।

হীরেন আর কথা না বলে লোটনের কাপড়ের আঁচল দিয়েই ওর হাত-পা বাঁধে। বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে কয়লা রাখবার ছোট খুপরিটায় ঢুকিয়ে দিয়ে শেকল তুলে দেয়।

বাইরে এসে কপালের ঘাম ফরসা সার্টের হাতা দিয়ে মুছে ঝুনুর দিকে তাকিয়ে বলে,—এক গেলাস জল দাও তো!

যেন দিগ্বিজয় করে এসেছে হীরেন! মেরে বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

আর যে ছেলেটা এই মার খেল বিনা প্রতিবাদে—সে ছেলেটা? ঘরের ভেতর মুখ নীচু করে পড়ে থাকে প্রায় ঘণ্টাকয়েক। তারপর ধীরে ধীরে যেন বোধ ফিরে আসে ওর। মাথাটা এতক্ষণ ফাঁকা ছিল, কোন চিন্তা কোন কথাই সেখানে ছিল না। শুধু এক বোবা আর্তনাদ ছাড়া। এখন ক্রমশ ওর মনে হয় মাথাটায় অসহ্য যন্ত্রণা। পা ওঠাতে পারে না, বিষের মতো ব্যথা।

এতক্ষণে ওর চোখের কোণ বেয়ে জল গড়ায়। মা মা বলে মুখ চেপে কাঁদে। এই প্রথম অজস্র কাঁদে লোটন। খুব কাঁদে। মাগো—আর পারচি না মা!—বুক ফেটে ভাষা বেরুতে চায়। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে আটকে যায়। শুধু ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপে।

অনেকক্ষণ কাঁদবার পর যখন একটু উঠে বসতে পারে লোটন তখন বিকেল পাঁচটা প্রায়। চোখ দুটো হাতের তালুর উলটো পিঠে ডলতে ডলতে জানালার ধারে আসে। ছোট একটাই মোটে জানালা, এক হাত লম্বা এক হাত চওড়া। পায়ের নীচে ঘন অন্ধকার আর কয়লার গুঁড়ো। জানালার গরাদ ধরে মুখটা বাড়ায়। বারান্দার ওদিক থেকে এখনও হাসি-গান-কথার ঢেউ এসে লাগে ওর কানে। গন্ধ আসে গরম রাধাবল্লভীর। খিদেয় পেটটায় জ্বালা ধরে। জানালা দিয়ে চোখে পড়ে সামনে বেড়ালটা কতকগুলো মাছের কাঁটা চিবোচ্ছে একমনে আরামে চোখ দুটো স্তিমিত করে। দেখতে দেখতে ওর জিভটা জলে ভিজে আসে। জিভ দিয়ে দুবার ঠোঁটটা ভিজিয়ে নেয়। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পা দুটো টনটন করতে থাকে। আবার বসে। নেমে ভিজে স্যাঁতসেতে মেঝেতে অন্ধকারে কয়লার গুঁড়োর ওপর শুয়ে পড়ে। চোখ দুটো ঘুমে টেনে আসে। কখন যে ও ঘুমিয়ে পড়ে, তা নিজেই বুঝতে পারে না।

ঘুম ভাঙে পর দিন ভোরে। শিকল খোলার শব্দে আর গিন্নিমার ডাকে ঘুম ভাঙে।

নে ওঠ। আর কখখনো অমন কাজ করবি নে। যা ওই খাবার ঢাকা আছে, খেয়ে বাসনগুলো মেজে নিয়ে আয়। ওঠ—।

উঠতে গিয়ে সমস্ত গা ওর টনটন করে ব্যথায়। তবু নীরবে ওঠে। উঠে নির্দেশমত গিয়ে সরা দিয়ে ঢাকা কলাপাতায় এঁটো বাসি রাধাবল্লভী ও মাছগুলো খেয়ে নেয় পাতা চেটে! তারপর এঁটো রেকাবি থালা গেলাস নিয়ে আবার কলতলা।

"মন্থর দিনের ভার যেন চেপে বসে লোটনের কাঁধে। দিনগুলো অকস্মাৎ বড্ড বড় মনে হয় আর রাত কাটতে চায় না—ঘুম আসে না। বিছানায় শুলে চোখে যেন ছুঁচ বেঁধায়। পাঁচটা দিন যেন পাঁচটা বছর মনে হয় ওর। বুড়ো শিবের কথাটাই মনে হয় ওর আজ বড় বেশী। কে জানে হয়তো বা শেয়ালের বাসা হয়েছে মন্দির। মাকড়সার জাল বুনেছে পাথরটার চারদিকে আর চামচিকে খাটাসের বসতি হয়ে উঠেছে দেয়ালে মেঝেতে। বুড়োটাও বোধ হয় ওকে ভুলে গেছে। ভুলে গেলি বুড়ো! চোখটা ছলছল করে ওঠে। কতদিন তোকে দেখি না! তোর কাছে নিয়ে চল আমায়! আর পারছি নে বুড়ো, সত্যি! অন্তরের সত্য জাগে। আর পারি না! এই সত্য মুক্তির সত্য, মুক্তি ওর চাই। যেমন করে হোক এখান থেকে মুক্তি চাই। চার দেয়ালের গহ্বর থেকে ওকে বেরোতেই হবে খোলা মাঠে, বনে, বিলের নরম মাটির বিশাল বুকে। নইলে ও মরে যাবে। ঠিক মরে যাবে এভাবে থাকলে।

প্রাণটা যেন পিষে গেছে ওর। শহর কলকাতার ধুলো আর ধোঁয়া, প্রাসাদ আর পাথর ওর বুকের ওপর চেপে বসেছে যেন। লোটন ছটফট করে। ওকে বেরোতেই হবে এখান থেকে।

দিন দশেক পরে একদিন সকালে দেবকুমারবাবু ঘরে একা বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। লোটন মনে খুব সাহস এনে ঘরে ঢোকে।

বাবু!

দেবকুমারবাবু তেমনি কাগজ পড়তে থাকেন।

আবার ডাকে লোটন,—বাবু!

কে রে? দেবকুমারবাবু ফিরে তাকান লোটনের দিকে। ভাল করে দেখেন আজ। ছেলেটা রোগা হয়ে গেছে অনেক। কালো চকচকে শরীরটা যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে অনেক। লোটনকে যখন ওরা মারে, দেবকুমারবাবু তখন বাড়ি ছিলেন না। পরে এসে শুনেছিলেন, কিছু বলতে পারেননি। সত্যিই চুরি করেছে সবাই যখন বললে, তখন তার ওপর আর কি বলা যায়। চুপ করে রইলেন। ভাল করেছ কি মন্দ করেছ কোন কথাই তাঁর মুখ দিয়ে বেরোল না।

তবু মন তাঁর বলছিল ছেলেটা চুরি করতে পারে না। জমিদারের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে যে সত্যি কথা বলতে পারে, সে আজ এত নীচে নামতে পারে না। তবু বলা যায় না কিছু। মানুষ চেনা সংসারে সবচেয়ে কঠিন। আজ যাকে ভাল বলে মনে হল কালই তাকে দেখা যায় অত্যন্ত জঘন্য কাজ করতে। মনের বৈচিত্র্যের অন্ত নেই, এই অন্তহীন মানুষের মনকে শুধু মন দিয়েই মাপা যেতে পারে, কিন্তু তাও ভুল হয়।

খুব হয়। তবু আজও দেবকুমারবাবুর মন বলে,—চুরি ও করেনি।

লোটনের দিকে তাকিয়ে সস্নেহে বলেন,—আমায় কিছু বলবি?

লোটন মুখ নীচু করে চুপ করে থাকে একটু সময়, তারপর বলে খুব আস্তে অথচ দৃঢ় কণ্ঠে—আমি বাড়ি যাব।

কেনরে, এখানে কি হল?

লোটন নীরব।

আসচে পুজোয় আমি যাব, গিয়ে তোকে রেখে আসব। আর মাস পাঁচেক থেকে যা।

লোটন নীরব।

আয়, কাছে আয়।

লোটন এগিয়ে আসে।

দেবকুমারবাবু ওর পিঠে হাত রাখেন।

একটু কষ্ট করে থাক না বাবা!

লোটনের চোখ জলে ভরে ওঠে।

তবু আরও একবার বলে,—আমি বাড়ি যাব।

তবে না হয় যা। কিন্তু কার সঙ্গে যাবি?

একাই যাব।

একা কি করে তোকে ছাড়ি। বড় মুশকিলে ফেললি তুই।

ইতিমধ্যে বেলা দেবী ঘরে ঢুকলেন। লোটনের কাঁধ থেকে চট করে হাতটা নামিয়ে নেন দেবকুমারবাবু।

বেলা দেবীর সন্ধানী নজর এড়াতে পারেন না তবু।

বেলা দেবী বলেন,—কি হল? কি কথা হচ্ছে?

দেবকুমারবাবু মৃদু হেসে বলেন,—ও বলছিল বাড়ি যাবে।

কেন?

কোন বিশেষ কারণ তো জানিনে। তবে বাড়ি যেতে চায়।

বেলা দেবীর ভ্রূ দুটো কুঁচকে ওঠে,—লোটনের সমস্ত দিনরাতের কাজের পরিমাণটা মনে মনে আন্দাজ করে নেন তিনি চট করে। ছেলেটাকে ছেড়ে দিলে কাজগুলো করবে কে।

বলেন তিনি,—না, না, এখন বাড়ি যাওয়া-টাওয়া হবে না।

আমিও তাই বলছিলুম, আর কয়েক মাস পরে পুজোয় না হয় যাবেখন।

বেলা দেবী তেমনি চটেই বলেন,—সে পুজোর কথা পুজোয়। এখন যাওয়া হবে না। সবে একটু মানুষের মতো করে শিখিয়ে পড়িয়ে এনেচি, এখন পালালে চলবে কেন?

তা বটে,—দেবকুমারবাবু একটু তিক্তকণ্ঠে বলেন,—তবে আমি বলি কি,—গলাটা নামিয়ে বলেন,—চোর-টোর বাড়িতে না রাখাই ভাল। তুমিই তো বলছিলে?

বেলা দেবী সত্যিই বলেছিলেন, কিন্তু তখন তো আর লোটনের কাজের পরিমাপটা তাঁর মাথায় আসেনি। একটু প্যাঁচে পড়ে আমতা আমতা করে বলেন—না, না, যা হবার হয়ে গেছে, তা বলে তো একে তাড়িয়ে দিতে পারিনে। ছেলেটা এমনিতে ভাল।

ভাল নাকি? যেন বিস্ময়ে আকাশ থেকে পড়েন দেবকুমারবাবু,—তোমরা তো জানতাম ওকে বিদেয় করতে পারলে বাঁচ! হঠাৎ আজ ও ভাল হয়ে গেল কি করে?

হঠাৎ হবে কেন? আমি খারাপ কখনও বলেচি।

বলোনি! তবে বোধ হয় আমি কানে কম শুনি।

নিশ্চয়ই তাই। চিরকাল তো কানে কালা হয়েই বসে আছ।

বেলা দেবী গলাটা একটু চড়ান,—সোজা কথা বলে রাখছি, বাড়ি যাওয়া ওর হবে না।

বেশ, তা না হয় হল।—দেবকুমারবাবু বলেন,—তবে ছেলেটা যখন ভাল তখন ব্যবহারটা আমাদের কাছ থেকে ভাল পাওয়া উচিত।

কি খারাপ ব্যবহার পায় শুনি? অন্যায় করলে শাসন করব না?

দেবকুমারবাবু মৃদু কণ্ঠে বিরক্ত হয়ে বলেন,—শুধু শাসনই পায় কিনা, তাই বলছি।

বেশ তাই পাবে,—বেলা দেবী চটেন।

লোটন এতক্ষণ চুপ করে ছিল,—আবার বলে,—আমি বাড়ি যাব।

না, যাবে না। একশবার যাবে না।—চাপা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন বেলা দেবী।

আবার বলে লোটন,—না, আমি যাব।

ফের মুখে মুখে কথা! যাও বেরিয়ে যাও ঘর থেকে।

লোটন ঘর থেকে বেরোয় না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। লোটনের জিদ চেপেছে, বাড়ি ও যাবেই।

আবার দাঁড়িয়ে রইলে?

লোটন নিশ্চল।

যাও!—বেলা দেবী লোটনের স্পর্ধায় বিস্মিত হন।

লোটন আজ গ্রাহ্যও করে না। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

বেলাদেবী এগিয়ে যান ওর কাছে।

দেবকুমারবাবু বলে ওঠেন,—আহা-হা ভব্যতা ভুলে যেও না। ছেলেটা তো ভাল!

দেবকুমারবাবুর মুচকি হাসিতে জ্বলে ওঠেন বেলা দেবী—তোমার আস্কারাতেই ওর আজ এত তেজ। দেখব পরে তেজ কোথা থাকে।

বেরিয়ে যান বেলা দেবী।

দেবকুমারবাবু ডাকেন,—শোন।

লোটন এগিয়ে আসে।

দেবকুমার বাবু পকেট থেকে একটা আধুলি বার করে বলেন,—নে, পয়সা দিয়ে কিছু কিনে খাস। এখন থাকবার চেষ্টাই কর।

আধুলিটা নিয়ে লোটন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

ও বুঝিয়ে বলতে পারে না দেবকুমারবাবুকে যে কি করে ও থাকবে। এক মুহূর্ত থাকতেই যে ওর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। বুকে পাথর চেপে বসে। ও যে মরে যাবে!

দেবকুমারবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার খবরের কাগজে মনোযোগ দেন।

লোটন বাইরে চলে আসে এতক্ষণে। বাড়ি ও যাবেই।

দিনের পর দিন ভেবেও কোন কূলকিনারা পায় না। কি করে ও বাড়ি যাবে! এরা যে কিছুতেই ছাড়তে চায় না। অথচ আর একটা দিনও ওর থাকতে ইচ্ছে হয় না। গাঁয়ের বটগাছের নীচের ছায়া, বৈশাখের বেসামাল বাতাস ওকে যে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এ ডাক উপেক্ষা করবার শক্তি ওর কই। খোলা আকাশের যেখানে সীমানা নেই, খেতের যেখানে নানা রঙ নানা মাসে, সেখানে যে ওর ঘর। ওর ঘর ঘোষালদের বাঁশবনে, ওর ঘর বেতঝোপের জঙ্গলের ভেতর বুড়ো শিবমন্দিরে। এখানে চার দেওয়ালের ভেতর পাথুরে আবহাওয়ায় ইস্পাতের কাঠিন্যে ওর মনটা যে পিষে যায়। কাকে বলবে ও একথা বুঝিয়ে? কে বুঝবে ওর বেদনা?

অনেক চিন্তা অনেক ভাবনার পর ও একটা ঠিক করে। হাত-পা-বাঁধা হতাশায় এক বিন্দু মুক্তির স্বাদ যেন! আট আনা পয়সা নিয়ে ও আজ যায় পোস্ট আপিসে। শুধোয়,—চিঠি নেকা যায় কি করে জানেন?

এক ভদ্রলোক বলে,—কোথায় লিখবি চিঠি?

আমার গাঁয়ে, মার কাছে।

পোস্টকার্ড কেন আগে।

কোথায় পাওয়া যাবে?

ওই তো খুপরির ভেতর থেকে।

কাঠের একটা পার্টিশনের কাছে গিয়ে আধুলিটা দিয়ে বলে,—একখানা চিঠি দিন।

লোকটা একটা পোস্টকার্ড দিয়ে ওকে পয়সা ফেরত দেয়।

পয়সা কটা আর পোস্টকার্ড নিয়ে সেই ভদ্রলোককেই বলে,—একটু লিখে দিন না বাবু?

যা, যা, এখন পারব না। ছেঁড়া ঝঞ্ঝাট যত!

ফিরে আসে খিঁচুনি খেয়ে।

বাড়ি চলে আসে।

বাড়ি এসে ঝুনুর পড়বার ঘরে ঢোকে। ঝুনু তখন স্কুলে।

দোয়াত-কলম নিয়ে নিজেই লিখতে বসে। বড় বড় কাঁচা হরফে শেষ পর্যন্ত একটা কথাই লিখতে পারে,—'মা' তারপর লেখে,—'মা, ইহারা আমাকে আটকাইয়া রাখিয়াছে আমি মরিয়া যাইব। লোটন।'

লিখতে লিখতে চোখটা দুবার মুছে নেয় হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে। আর কি লিখবে, কি করে লিখবে? কিছুই ওর মনে আসে না। আকণ্ঠ ভরে ওঠে অশ্রু-আবেগে।

পোস্টকার্ডখানা নিয়ে আবার যায় পোস্ট আপিসে।

একটি ফতুয়া-পরা ভদ্রলোক টেবিলে বসে কি যেন লিখছে। বোধহয় মনি অর্ডার ফর্ম।

তাকে গিয়ে বলে,—বাবু ঠিকানাটা লিখে দেবেন?

কিসের ঠিকানা? চশমা থেকে চোখ উঁচু করে তাকায় লোকটি।

পোস্টকার্ডখানা বার করে দেয় লোটন,—মা, সুধন্য হালুইকরের বাড়ি।

লিখে লোকটা বলে,—পোস্ট আপিস কোথায়?

ওই হোথাকে, আমাদের গাঁয়ের কাছেই।

গাঁয়ের নাম লিখে পোস্টকার্ডখানা নিয়ে সবাই যেখানে চিঠি ফেলে সেখানে ফেলে দেয়।

এতক্ষণে ওর মনটা একটু খুশী খুশী হয়ে ওঠে। যাক, মা নিশ্চয়ই চিঠি পাবে।

কাকিমা কাকাও নিশ্চয়ই একটা কিছু করবে। চিঠিটা ওরা পাবেই। মা ওর চিঠিখানা পড়বে ভাবতেই ওর মাথাটা তুলে ওঠে। চোখতুটো চিকচিক করে আসে।

বাড়ি চলে আসে। তু-তিন দিনের ভেতর নিশ্চয়ই বাবুকে ওরা চিঠি লিখে দেবে তাকে ছেড়ে দিতে। নিশ্চয়ই। আর মোটে তিনটে দিন। বাড়ি এসে বারান্দায় দাঁড়ায় লোটন আকাশের দিকে তাকিয়ে। ওই যে বড় বাড়িটা, ওই-খানেই আকাশটা ঠোক্কর খেয়ে আটকে গেছে। কিন্তু তাদের ওখানে? যতদূর তাকাও, শুধু আকাশ। স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠে লোটন! ওর গাঁয়ের স্বপ্নে।

অনেক পরে বেলা দেবীর ডাকে ওর সম্বিত ফিরে আসে। বিকেলের কাজের সময় হয়ে এল বোধহয়।

দিন পাঁচেক চলে যায়। পোস্ট আপিস লেখবার একটু গোলমাল হওয়াতে চিঠিখানা পৌছোতে পাঁচদিন লেগে যায়। ঠিক তুপুর বেলা গাঁয়ের পিওন এসে হাঁকে,—কে আছ? চিঠি আছে।

টুলু এসে পোস্টকার্ডখানা হাতে নেয়।

গোলাপবালা আর কামিনীবালা খেতে বসেছিল। চিঠির নাম শুনে এঁটো হাতেই উঠে চলে আসে। গোলাপবালা পিওনকে শুধোয়,—কার চিঠি গা?

গাঁয়ের পিওন সকলেরই চেনা। ও হেসে বলে,—লোটনের মায়ের চিঠি।

কে নিখেচে?

লোটনা।

লোটনা! গোলাপবালার মুখখানা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কামিনীর গা টিপে বলে,—ও দিদি গো, তোমার ছেলে চিঠি নিখেচে! লোটন আবার চিঠিও নেকে!

কামিনীর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে পুত্রগর্বে। লোটন চিঠি লিখেছে। তার লোটন আবার কলকাতা থেকে চিঠি লিখবে তার মাকে এ যে স্বপ্নেরও অগোচর।

কি লিখেচে, পড়ে দাও না বাবা। নেকাপড়া তো জানিনি!

পিওন হাসে,—ছোঁড়াটা পাগলা বটে। লিখেচে সে মরে যাবে, তাকে আটকে রেখেচে। দেখ দিকিন পাগলের কাণ্ড! এমন কথা মানুষ লেখে।

বলে হাসতে হাসতে চলে যায় পিওন।

কামিনীর মুখটা কাগজের মতো শাদা হয়ে যায়।

মুখরা গোলাপবালাও কিছুক্ষণ কথা বলতে পারে না।

টুলু পোস্টকার্ডখানা হাতে নিয়ে বলে,—মরে যাবে কেন মা?

ধমকে ওঠে গোলাপবালা,—চুপ কর মুখপোড়া। ও আবাগীর ব্যাটা পিওন নেকাপড়া জানে না। যা নয় তাই বলে গেল গা। চল দিদি, কামাখ্যার দেওরকে দিয়ে পড়িয়ে আনি।

ভেতরে এসে হাত ধুয়ে ওরা যায় পাশের বাড়ি কামাখ্যার দেওরের সন্ধানে। সে গাঁয়ের পাঠশালার পণ্ডিত।

বলি ও কামেখ্যা! তোর দেওর কোথাকে?

কামাখ্যা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

কেন গো দিদি?

গোলাপবালা বলে,—একখানা চিঠি পড়তি হবে।

এখুনি এল বলে। একটু বোসো না দাওয়ায়।

দাওয়ায় একখানা মাদুর পেতে দেয় কামাখ্যা। সেখানেই বসে ওরা।

কামিনীবালা আঁচলে চোখ ঢাকে। বুকটা ওর মুচড়ে দিচ্ছে আথ মোচড়াবার মতো।

কেঁদ না বাপু!—গোলাপবালা বলে,—হুট বলতে ফুট করে কি একটা কাগের মুখে খবর শুনে কেঁদনি!

কামিনীর চোখের জলের তো কান নেই যে শুনবে! দরদর করে গাল বেয়ে পড়তে থাকে।

একটু পরেই কামাখ্যার দেওর শ্রীনাথ আসে।

ছিনাথ ঠাকুরপো, এই চিঠিখানা পড়ে দাও না।—কামাখ্যা বলে।

কামিনী আর গোলাপবালা ঘোমটা দিয়ে বসে থাকে।

লিখেচে, মা, ইহারা আমাকে আটকাইয়া রাখিয়াছে। আমি মরিয়া যাইব। লোটন।

কেঁদে ওঠে কামিনী,—নিকেচে মরে যাবে? আমি কি করব গো! লোটনা মরে যাবে গো! ডুবন্ত মানুষ যেমন হাতড়ে সামনে কিছু আশ্রয় না পেলে হতাশ চোখে চারদিকে তাকায় তেমনি তাকায় কামিনীবালা। হতাশ আতঙ্কিত চোখে।

যেন হাতড়ে ফেরে মনে মনে গভীর হতাশায়।

ডুবে যাবে কামিনীবালা।

গোলাপবালা ওকে হাত ধরে ওঠায়।

পোস্টকার্ডখানা তুলে নিয়ে কামিনীকে ধরে নিয়ে আসে।

আমি কি করব গো!—কাঁদতে থাকে কামিনী।

গোলাপবালার চোখ বেয়ে টসটস করে জল পড়ে, তবু গলায় যতটা পারে ঝাঁজ এনে বলে,—বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে! যেমন কপালখানা করেছ। তোমার কপালে আর কিছু থাকবে! সব যে উড়ে-পুড়ে যাবে। অমন জলজ্যান্ত ছেলেটা গা!

কামিনীর চোখের জল তেমনি পড়ে।

ট্যাকার লোভে শহরে পাঠিয়ে মারলে গা! মাগীর বরাতের বলিহারি —গোলাপবালার মুখের ঝরনা খুলে গেছে যেন,—চোখে জল, মুখে জবাব,—লোটন আমার মরে গেল গা! যাবার আগেও সেদিন বলেচে, খুড়ী, আর দুটো আম দাও। আম বলতে অজ্ঞান! আর নলেন গুড়! কত কান্দাকাটা করত না দিলে! এখন হল তো! তোমায় পেট ভরে ভরে আম দোব, খেও। আরও পাঠাও শহরে। উঃ মাগো, মাথাটা জলে গেল! মাগী আবার আমার নামে পুটুর পুটুর করে লাগাত লোটনের কানে। তাই তো লোটনা আমার কথা না শুনে চলে গেল। ও কি কম! আমার ওপর বিষ করে দিয়েছেন! তেমনি নে এখন! মরল তো! উঃ মাগো!

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে ক্রমাগত লোটনের মাকে গাল পাড়তে থাকে

গোলাপবালা। আর কিই বা করতে পারে ও। কামিনী ওর মনটা দেখে আজও। আজও গোলাপের ভালবাসার সুষমায় ঢেকে যায় যেন ওর কর্কশ ভাবণগুলো। কামিনী নীরবে বসে থাকে। হতাশায় ভয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে। শুধু চোখের জল আর ফুরোয় না।

সন্ধ্যের একটু পর সুধন্য দোকান থেকে ফিরে আসে। ঘরে আলো নেই। বাড়িতে মনে হয় যেন লোক নেই। গোলাপবালা শয্যা নিয়েছে। বিছানায় ছটফট করছে জ্বালায়,—উঃ! মেরে ফেললে গা ছেলেটাকে! আর তো খুড়ী বলে ডাকবে না! কি করব আমি!

কামিনী রান্নাঘরে পড়ে থাকে মাটির ওপর।

টুলু বাড়ির অবস্থা বেগতিক দেখে বাগানে বসে থাকে একা।

সুধন্য ফিরতেই টুলু সুধন্যর পেছু পেছু আসে।

ঘরে দোরে আলো না দেখে সুধন্যর মেজাজ চড়ে যায়,—অলক্ষি লাগিয়ে দিলে! ঝাঁটপাট নেই! পিদিম দেয়া নেই! সব কি মরেচে?

বলে ঘরে ঢুকে রাগে গরগর করে।

গোলাপবালার ঝালটা এবার পুরো গিয়ে পড়ে সুধন্যর ওপর—সবাই কেন মরবে! তুমি মর! তোমাকে চোখখেকো যম দেখেও দেখে না। যমের দিষ্টি লোটনের ওপরেই পড়ল গা!

সুধন্য ব্যাপারটা সুবিধের নয় বুঝতে পারে। গলাটা নরম করে বলে,—কি হল, চেঁচাচ্ছ কেন?

চেঁচাবে না! তোমায় সোয়াগ করে কথা বলব! মুয়ে আগুন! এই মুখ আবার মানুষকে দেখাচ্ছ! হায়াও নেই গা! লোটনকে তো মারলে! এবার কাকে মারবে শুনি! নাও না কাটারিটা, নিয়ে আমার গলায় একটা কোপ দিয়ে আমায় মার।

কি হল?—সুধন্যর গলা আরো নরম। বোঝে যে ব্যাপারটা গুরুতর।

হবে আবার কি! যা হবার তাই হয়েছে। তোমার পেরান ঠাণ্ডা হয়েচে।

সুধন্য যেমন বিস্মিত হয়, তেমনি ভীত হয়,—যা হবার কি আবার হল, বল, শুনি।

যাও এখান থেকে,—খিঁচিয়ে ওঠে গোলাপবালা। বল শুনি! তোমার সঙ্গে এখন আমি গল্প করতে বসব! আদিখ্যেতা সীমা ছাড়িয়ে গেল গা! এই নাও। দেখ!

পোস্টকার্ডখানা ফেলে দেয় সুধন্যর সামনে।

সুধন্য নিজেই প্রদীপটা জ্বালায়, পোস্টকার্ডখানা পড়ে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে।

গোলাপবালা জ্বালাময়ী কণ্ঠে আবার ডাক ছাড়ে,—উঃ! সব খুনে! বাপ-মা বেছে বেছে খুনের হাতে দিইচিল আমায়! এমন ঘর মানষে করে!

সুধন্য বহুক্ষণ চুপ করে থাকে।

গোলাপবালা যখন চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ, তখন সুধন্য ওঠে,—গোলাপবালার সঙ্গে কথা বলতে ভরসা হয় না। দোরের সামনে গিয়ে ডাকে,—বৌঠান?

বৌঠান কামিনী দু তিনটে ডাকের পর উঠে আসে। চোখমুখ ফুলে উঠেছে কেঁদে কেঁদে। সুধন্য অনুতপ্ত কণ্ঠে বলে,—কি করতে বলেন এখন?

চুপ করে থাকে কামিনী। কিই বা বলবে!

সুধন্য বলে আবার,—ও তো মরে নি। মনটা হয় তো খুব হাঁসপাঁস কচ্ছে। তাই লিকেচে।

হাঁসপাঁস কচ্ছে!—ফোঁস করে ওঠে গোলাপবালা;—কানে কানে বলেচে তোমায়। যাও বেরিয়ে, যাও আজই বাড়ি থেকে। শহরে গিয়ে সে ছেলেকে নিয়ে তবে এ বাড়িমুখো হবে বলে রাখলুম।

গলাটা ভিজে ওঠে গোলাপবালার বলতে বলতে,—সে কি ভয়তরাসে ছেলে গা! থেটের মতো জোয়ান ছেলে! নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে তার। যাবার সময় মুখখানা কালো হয়ে গেল। বললে,—খুড়ী কেঁদো না, আবার আসব! আর এয়েচে! জন্মের মতো এয়েচে। ভাল চাও তো ছেলে এনে দাও। নয় তো কি কাণ্ড করি দেখবে?

সুধন্যের মুখ পাংশু হয়ে যায়,—তবে কি আজ রাতের গাড়িতেই যাব?

হ্যাঁ এক্ষুনি। আর ও পোড়াকপালীকে সঙ্গে নে যাও। তবু যদি চোক্ষে দেখতে পায়। কামিনীর দিকে তাকিয়ে বলে—ন্যাকা মাগী, বল না নিজে মুকে শহরে যাবে। এমনি তো সব উড়িয়ে পুড়িয়ে ছারখারে দিতে পার। আর দেওরের কাছে এত লজ্জা! বলেহারি!

গোলাপবালা আজ যেন সপ্তম থেকে সপ্তদশে চড়েছে।

কেউ আর কথা বলতে সাহস করে না।

সুধন্য শুধু মিনমিন করে বলে,—তবে গুছিয়ে নিন বৌঠান। একটু পরেই বেরোতে হবে।

কামিনী ভাঙাগলায় কথা বলে এতক্ষণে,—গুছোব আর কি ঠাকুরপো। যেমনি আছি তেমনি যেতে পারবখুনি।

সুধন্য একটা বুঁচকি বেঁধে নেয়। টাকা বার করে নেয় বাক্স থেকে। গোলাপবালা ওঠে না বিছানা থেকে। বাক্সের চাবি ফেলে দেয় ঝনাত করে—বার করে নাও টাকা।

আড়চোখে দেখে আর বকবক করে যায় অনবরত।

ওদের বার করতে পারলে বাঁচে গোলাপবালা।

সুধন্যও বেরোতে পারলে বাঁচে। গোলাপবালার চোখের আগুনে পুড়ে যাবার দশা হয়েছে ওর। কামিনী পারলে ছুটে কলকাতায় চলে যায় আর কি! এক এক মুহূর্ত ওর যেন এক এক যুগ মনে হয়। বুকের বাতাস ভারী পাষাণের মতো। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয় যেন।

কতক্ষণে ও যাবে শহরে—দেখবে ওর লোটনকে?

লোটন কি থাকবে ওখানে?

কে জানে। ওর যা বরাত? সত্যি বুঝি ওর বরাতে সব পুড়ে জলে যায়। গোলাপবালা ঠিকই বলে। আরও বলুক। আরও শুনুক কামিনী। শুনতে শুনতে প্রাণটা বেরোয় না কেন?

ইচ্ছে হয় চীৎকার করে কাঁদে—ওরে লোটনরে! লোটন বাবা কোথায় রে।

কিন্তু চীৎকার করতে পারে না। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। একটু আওয়াজ বুঝি বেরোতে চায় না গলা দিয়ে।

একটু সময়ের ভিতরেই রওনা হয় ওরা।

তিন দিন তিন রাত কেটে গেল। চার দিন কাটে প্রায়। দুপুর বেলা বারান্দায় বসে বসে হাঁপায় লোটন। আর সময় কাটে না। আর তো ধৈর্য থাকে না। কাল রাতে লুকিয়ে কেঁদেছে লোটন। বালিশ ভিজে গেছে চোখের জলে! মা—মা—বলতে বলতে ওর গলা বন্ধহয়ে এসেছে। মনে মনে ডেকেছে চালতেতলার বুড়োশিবকে। বুড়ো, নিয়ে চল আমায় মায়ের কাছে। বড্ড কষ্ট হচ্ছে, কষ্ট হচ্ছে তোর জন্যে আর মায়ের জন্যে। সত্যি বলছি বুড়ো।

শিশুপ্রাণের সেই নিরুদ্ধ আবেদন চালতেতলার বুড়ো শিবের ভাঙা মন্দিরে পৌঁছয় কিনা কে জানে! কে জানে বহু যুগের সেই নীরব পাষাণ ওর প্রাণের অসহ্য আবেদনকে সত্যের কাছে কতটুকু মূল্য দেয়। লোটনের প্রাণের মূল্য সংসারে কতটুকুই বা! সত্যিই!

লোটন তাকায় বারান্দার ওপরে। সামনে বাড়ির আলসের ওপর পায়রা দুটো নেই? পড়ে আছে আলসের ওপর ভাঙা কয়েকটা পায়রার ডিম? প্রখর রৌদ্রে তেতে পুড়ে ফেটে শুকিয়ে গেছে ডিমগুলো। বুকটাও ওর শুকিয়ে আসে। ও শেষ পর্যন্ত স্থির করে ফেলে একা একাই যাবে। গোটা কতক টাকা যোগাড় করতে পারলেই ও চলে যেতে পারে—একেবারে যেতে পারে। আর কখনও আসবে না শহরে। শহরের বন্ধ জীবন আর একমুহূর্তও ভাল লাগে না ওর। কোনদিনই নয়।

কিন্তু টাকা কই? টাকা যোগাড় করতেই হবে। পরে না হয় মায়ের জমা পঁচিশ টাকা থেকে এটা শুধে দিলেই চলবে। যাবে নাকি চাইবে নাকি একবার ঝুনুর কাছে ধার? ধার দিতেও পারে ঝুনু, বলা যায় না। ঝুনু ওর প্রতি ততটা নির্দয় নয় যতটা হীরেনবাবু। তখনও দুপুর গড়িয়ে যায় নি। বিকেল হতে এখনও কিছু দেরি আছে। হয়তো বা দিদিমা ঘুমুচ্ছেন এখনও।

কলে জল না এলে ওঠেন না। বোঁচকা কাঁধে সেই লোকটা যখন—'সাবান তরল আলতা চাই, মাথার কাঁটা কিলিপ্ চাই—' হাঁকতে হাঁকতে যায় রাস্তা দিয়ে তখনই ঠিক ওঠেন গিন্নিমা। হয়তো বা সেই ডাক শুনেই। ডাকটাও যেন ঠিক একই সময়ে কানে আসে। একটু নড়চড় নেই।

ও ঝুনুর পড়বার ঘরে এগিয়ে আসে। ঘরে ঢোকে। দেখে বারান্দায় ঝুনু আর হীরেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। ও দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ দরজার সামনে।

হীরেন আজ ভারী খুশী। ওর বাপের চিঠি এসেছে।

কি লিখেছেন ? শুধোয় ঝুনু।

লিখেছেন একটি মেয়ে তিনি ঠিক করে ফেলেছেন আমার বিয়ের জন্যে।

মুখটা শুকিয়ে যায় ঝুনুর,—তাই নাকি, বেশ তো।

এবার হীরেন মনে মনে হাসে। মেয়েরা এমনই। ভাঙে তো মচকায় না।

তবু আবার বলে,—হ্যাঁ, দিনও আর খুব বেশি নেই। আগামী সপ্তাহেই পাকা দেখা করতে যাবেন। মেয়ের বাপকে তিনি চিঠি দেবেন আজকালের ভেতর।

বাঃ ! বেশ মজা হবে। মেয়েটি কেমন দেখতে।

ঝুনু জোর করে হাসি আনতে চায় মুখে।

হীরেন বলে—মজা তো হবেই। তুমি কি দেবে আমার বিয়েতে ?

এখন কি করে বলব ?

তবু একটা আন্দাজ করে বল না।

মেয়েটির নাম বল। কি নাম ?

নাম !—একটা ঢোঁক গিলে হীরেন আবার বলে,—নাম ?

হ্যাঁ গো। নামটি কি ? তাই দিয়ে তো আমার উপহার তৈরি হবে।

নাম, ঝুনু।

ধ্যেত! ঝুনুর মুখখানা মুহূর্তে রাঙা হয়ে ওঠে।

সত্যিই তাই। হীরেন এগিয়ে আসতে চায় ঝুনুর আরও কাছে। ঝুনু সরে যায়।—এতক্ষণ তবে কার কথা বলছিলে?

যে পাশে দাঁড়িয়ে আছে, তার কথাই।

আমার যদি অমত হয়?

তোমার বাবার মতেই তোমার মত হবে।

তাঁরও যদি না হয় মত?

তবে অনশন করব।

তাতেও যদি না হয়?

সামনে না খেয়ে মরে যাব, তবু মত হবে না?

খিলখিল করে হেসে ওঠে ঝুনু।

হঠাৎ টেবিলের কাছে কি একটা শব্দ হতেই ঝুনু চোখ ফিরিয়ে তাকায়, লোটন টেবিল থেকে যেন কি একটা তুলে নিলে মনে হল।

ঝুনুকে দেখেই লোটন তাড়াতাড়ি যেতে চায়।

ঝুনু ডেকে ওঠে,—এই, দাঁড়া।

এগিয়ে আসে। হীরেনও এগিয়ে আসে।

টেবিলের ওপর হীরেনের টাকার ব্যাগটা ছিল, সেটা খোলা।

ঝুনু এগোয় লোটনের সামনে,—কি নিয়েচিস টেবিল থেকে?

লোটনের মুখখানায় একটুও রক্তের আভাস পাওয়া যায় না।

ঠোঁট দুটো নীল হয়ে ওঠে ভয়ে। কাঁপতে থাকে।

কি নিয়েচিস?—বলে হীরেন এগিয়ে আসে। ওর হাত মুঠো দেখে বলে,—হাতের মুঠো খোল।

হাতের মুঠো লোটন খোলে না।

হাতের মুঠোটা ধরে মোচড়াতেই লোটনের হাত থেকে টুপ করে একটি পাঁচ টাকার নোট পড়ে মেঝেয়।

আবার চুরি!

গিন্নিমাও গোলমাল শুনে উঠে আসেন।

হীরেন ওকে এলোপাথারি মারতে থাকে।

গিন্নিমাও গর্জে ওঠেন,—আবার আটকে রাখ ওকে ওই ঘরে।

হীরেনও গর্জায়,—না, ওকে পুলিসে দোব।

থাক বাপু, পুলিসের হাঙ্গামায় কাজ নেই।—বলে ঝুনু।

হীরেনের মার খেয়ে আজ আর জ্ঞান থাকে না লোটনের প্রায়। পড়ে গোঁ গোঁ শব্দ করতে থাকে।

হীরেন ওকে টানতে টানতে নিয়ে সেই ঘরেই আটকে রাখে আবার।

কিছুক্ষণের ভেতরই প্রচণ্ড জ্বর আসে লোটনের। মাথাটা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়তে থাকে। প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে সেই কয়লার গুঁড়োর ওপর। জ্বরের ঘোরে চীৎকার করে ওঠে মাঝে মাঝে,—আর করব না! ওরে বাবা, মরে গেলুম। মাগো আর করব না!

বাবু রাত্রে এসে সব শোনেন আর শোনেন ছেলেটার চীৎকার।

মুখখানা ভারী হয়ে ওঠে দেবকুমারবাবুর। কয়লা-ঘরে গিয়ে দোরটা খুলে দেন। গায়ে হাত দিয়ে দেখেন, ভীষণ জ্বর ছেলেটার।

বেলা দেবী ধমকে ওঠেন,—খবদ্দার ওর গায়ে হাত দিও না।

কেন?—ভ্রূ কুঁচকে তাকান দেবকুমারবাবু।

না। চোরের শাস্তি হোক!

তা হীরেন শাস্তি দেবার কে? হীরেনকে কি আমি মারবার জন্যে বহাল করেছি!—মুখটা লাল হয়ে যায় দেবকুমারবাবুর।

ঝুনু শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায়।

বেলা দেবী বলেন,—আমি বলেছি মারতে তাই মেরেচে। বেশ করেচে। তুমি হয় ওখান থেকে চলে এসো, নয় তো এখুনি আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব।

দেবকুমারবাবু গুম হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। লোটনের দিকে একবার তাকান, একবার স্ত্রীর দিকে। তারপর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ধীর

পায়ে নিজের ঘরে চলে আসেন। একটা কথাও বলেন না আর। কিই বা বলবেন ? কাকেই বা বলবেন ?

সমস্ত রাত কাটে। পরদিনও কাটে। জ্বরের ঘোরে একভাবেই পড়ে থাকে ছেলেটা। কোন জ্ঞানই থাকে না। মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে কি বলে— বোঝা যায় না। দুপুরের দিকে গিন্নিমা ওর ঘরে একবাটি বার্লি আর একটা এনামেলের গ্লাসে একগ্লাস জল দিয়ে যান।

খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুমোন বেলা দেবী, বিকেলে উঠে একবার লোটনের ঘরের সামনে আসেন। এসে দেখেন দরজাটা খোলা, কলাইকরা বাটি ভর্তি বার্লি পড়ে রয়েছে। জলের গ্লাসটাও উল্টে রয়েছে। চারদিকে কিছু লাল পিঁপড়ে ধরেছে মিষ্টি বার্লির বাটির চারদিকে। বেলা দেবীর মুখটা শুকিয়ে যায়। আবার কিছু নিয়ে-টিয়ে পালাল না তো! চোর ছোড়াটাকে একটুও বিশ্বাস নেই তো! জ্বর গায়ে গেল কোথা ? গয়নাপত্তরগুলো ভাল করে মিলিয়ে দেখতে হবে একবার। কে জানে কি নিয়ে সরে পড়েছে।

বিকেলের দিকে দেবকুমারবাবু আসেন। কোন কথা না বলে জামাটা খুলে ইজিচেয়ারে বসে একটা বই খুলে পড়তে থাকেন। বেলা দেবী ঘরে ঢোকেন, কিছু বলতে সাহস করেন না। ছেলেটা পালিয়েছে শুনলে দেবকুমারবাবু হয়তো আজ ভীষণ চটে যাবেন। এটা-ওটা নাড়াচাড়া করতেই দেবকুমারবাবু পকেট থেকে একখানা চিঠি বার করে দেন বেলা দেবীকে,—হীরেনের বাবা লিখেছে।

কি লিখেছে ?

পড়ে দেখ !

চিঠিখানা কলেজের ঠিকানায় এসেছে। বেলা দেবী পড়েন। হীরেনের সঙ্গে ঝুমুর বিয়ের প্রস্তাব করে লিখেছে। যদি মত থাকে, তবে সামনের সপ্তাহেই পাকা দেখা করতে চায়।

বেলা দেবী ঠিক যা চেয়েছিলেন, তাই হাতের মুঠোয় পেয়ে ভারী খুশী,— তোমার এতে অমত নেই তো ?

বিন্দুমাত্রও নয়।—উদাসী কণ্ঠ দেবকুমারবাবুর।

ছেলেটি কিন্তু বড় ভাল। আমারও মনে এমনি একটা ইচ্ছে বরাবর ছিল।

তাই নাকি!

কেন, ছেলে তো চমৎকার। তাছাড়া মেয়েরও বয়েস হল!

দেবকুমারবাবু নীরব।

তবে চিঠি লিখে দাও একখানা।

তুমিই লেখ।—দেবকুমারবাবু বলেন।

বেলা দেবী একথা সেকথার পর বলেন,—শোন, ছোঁড়াটা দেখছি আজ পালিয়েছে।

কে?—চমকে ওঠেন দেবকুমারবাবু।

লোটন। কিছু নিয়ে আবার সরে পড়ল না তো।

দেবকুমারবাবুর ভ্রূদুটো কুঁচকে ওঠে। কথা বলেন না।

কোথায় যে পালাল! বিকেল থেকে ঘরে নেই।

দেবকুমারবাবু বাক্যহীন।

আসবে হয়তো আবার। কোথায় আর যাবে!

দেবকুমারবাবুর কাছ থেকে জবাব আসে না।

বেলা দেবী আর কথা না বাড়িয়ে চলে যান ঘর থেকে।

পরদিন রাত্রেই এসে পৌঁছয় সুধন্য আর কামিনীবালা। জমিদার-বাড়ি থেকে ঠিকানা নিয়ে এসেছে ওরা। বাসা খুঁজে বার করতে করতে প্রায় রাত দশটা হয়ে যায়। দোরে কড়া নাড়তে দোর খুলে দেন দেবকুমারবাবু। এত রাত্রে আবার কে এল।

বাবুকে প্রণাম করে বলে সুধন্য,—ভাল আছেন বাবু?

কে আপনারা?

আমি লোটনের খুড়োমশাই, আর এনা ওর মা।

একটু তফাতে থেকে মাটিতে মাথা রেখে প্রণাম করে কামিনীবালা।

দেবকুমারবাবুর মুখখানা পাংশু হয়ে ওঠে। মনে পড়ে লোটনকে নিয়ে আসবার দিন ওর মায়ের কান্না। আর তাঁর নিজের প্রতিশ্রুতি—জলে তো পড়ছে না। কোন ভয় নেই তোমার লোটনের জন্যে। তোমার ছেলে আবার ফিরে পাবে।

মাথাটা ঘুরে ওঠে দেবকুমারবাবুর। স্নায়ুর সমতা রাখতে অক্ষম হয়ে পড়েন। লোটন কোথায় দেবকুমারবাবু তো জানেন না। আজ কি জবাব দেবেন তিনি লোটনের মাকে!

আসুন।

বলে ভেতরে নিয়ে আসে ওদের দেবকুমারবাবু।

বেলা দেবী বেরিয়ে আসেন।

দেবকুমারবাবু বলেন,—এই লোটনের মা, আর এই ওর খুড়ো।

বেলা দেবী সহসা কোন কথা বলতে পারেন না।

কে জানত যে লোটন ছোঁড়াটার আবার মা আছে।

বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয় বেলা দেবীর কপালে, নাকের ডগায়,—তা আপনারা হঠাৎ—।

হঠাৎ নয় গো দিদি—বলে লোটনের মা ঘোমটার তলা থেকে,—লোটন চিঠি লিখেচে তাই!

লোটন চিঠি লিখেছে? বেলা দেবীর বুকের ভেতরটা ভয়ে শুকিয়ে ওঠে। তবে কি মারপিটের কথা সবই লিখেছে লোটন! আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন তিনি। সামনে ঝুনুকে দেখে বলেন,—এক গেলাস জল নিয়ে আয় তো মা!

লোটন কেমন আছে বাবু? শুধোয় সুধন্য।

দেবকুমারবাবু নীরব।

লোটন কি ঘুমুচ্ছে? কমনে দেখিয়ে দিন না!

দেবকুমারবাবু শুধু তাকিয়ে থাকেন ফ্যালফ্যাল করে! কথা বলতে পারেন না।

বেলা দেবী বলেন।—কে লোটন? সে তো কবে চলে গেছে আমাদের বাড়ির কাজ ছেড়ে। কোথায় অন্য কোন একটা বাড়িতে কাজ করতে গেছে।

সে ঘর কম্‌নে পড়বে দিদি। দেখিয়ে দিন না চলে যাই।

সে ঠিকানা আমরা জানি না। আমরা এসব কিছু জানি না,—ক্রমশ কঠিন হয়ে ওঠে বেলা দেবীর কণ্ঠস্বর।—আপনারা যেখানে খুশি যেতে পারেন। এত রাত্তে বিরক্ত করতে আসবার মানে কি?

সুধন্য একটু ঘাবড়ে যায়।

পোঁটলাটা হাতে তুলতে যায়।

দেবকুমারবাবু স্তম্ভিত হয়ে এতক্ষণ বেলা দেবীর মিথ্যাগুলি শুনছিলেন। চোয়াল দুটো তাঁর কঠিন হয়ে আসে ক্রমশ। কি ঘৃণিত মিথ্যেবাদী তাঁর নিজের স্ত্রী।

দাঁড়ান।—বলেন সুধন্যকে।

সুধন্য পোঁটলাটি আবার নামায়।

গম্ভীর কঠোর কণ্ঠে বলেন দেবকুমারবাবু—আমার স্ত্রী তোমাদের মিছে কথা বলেছে। লোটনকে আমরা মেরেছিলাম, জ্বর হয়েছিল। বিকেল থেকে জ্বর নিয়ে যে কোথায় গেছে পাওয়া যাচ্ছে না।

বেলা দেবী ঘরে ঢুকে পড়েন। খিলটাও বোধ হয় লাগিয়ে দেন সন্তর্পণে।

দেবকুমারবাবুর কণ্ঠ ভিজে আসে—লোটনের মাকে বলেন,—তোমার লোটনকে আমি ফিরিয়ে দোব মা, কথা দিচ্ছি, তোমরা বিশ্রাম কর। আমি খোঁজ করতে বেরোব এক্ষুনি।

লোটনের মা বসে পড়ে সেখানে। ঘোমটা খসে পড়ে যায়। ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

সুধন্য হতভম্বের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চৌকাটের পাশে বসে পড়ে।

দেবকুমারবাবু বেরিয়ে যান। বেরিয়ে গিয়েই সমস্ত থানায় ফোন করেন। কোথাও কোন খবর মেলে না। নিজে বাড়ির চারদিকের গলিতে গলিতে রাস্তায়

রাস্তায় হেঁটে হেঁটে তন্নতন্ন করে খোঁজেন। শুধোন কাউকে বা, হ্যাঁ মশাই, একটি ছেলেকে দেখেছেন এদিক দিয়ে যেতে—হাপ-প্যান্ট-পরা, খুব জ্বর গায়ে?

উত্তর আসে,—না।

কাছাকাছি ছোট ছোট দু তিনটে পার্কে দেখেন কোথাও শুয়ে আছে কিনা।

না। কোথাও নেই।

রাত্রি প্রায় দেড়টা পর্যন্ত হেঁটে হেঁটে দেবকুমারবাবু নিজেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। পার্কের একটা বেঞ্চিতে বসে পড়েন। ভাবতে পারেন না আর যে কোন মুখে বাড়ি যাবেন, কি বলবেন লোটনের মাকে।

জীবনটা দেবকুমারবাবুর সহজ থেকেও বেঁকে যায় শুধুমাত্র ওই স্ত্রীটির জন্য। এত শান্ত সহজভাবে থাকবার চেষ্টা করে আসছেন আজীবন কিন্তু থাকবার জো কই। সুতো যতই টান করুক না কেন, বেলা দেবী ঠিক একটি বড় রকমের জট পাকিয়ে বসে থাকেন। জীবনটা হয়তো বা এই ভাবেই কাটবে। এক বিবাহের প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে দেবকুমারবাবুর ভর-জীবন। মিথ্যায় ভরা ফাঁকা অহংকারে রক্তিম ওই মেদবহুল তথাকথিত সংস্কৃতি-সম্পন্ন নারীটির বোঝা দেবকুমারবাবু আর বইতে পারেন না যেন। মাঝে মাঝে আজকাল অসহ্য লাগে।

রাত আড়াইটা বেজে গেল।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে তিনটে।

তারপর?

যে বাড়িটি থেকে ফোন করেছিলেন সেই বাড়িতেই গিয়ে তাদের আবার জাগিয়ে তোলেন।

এবার শেষ চেষ্টা। সব হাসপাতালে ফোন করেন। খবর মেলে।

গতকাল দুপুরে জ্বরে অজ্ঞান হয়ে একটি ছেলে রাস্তায় পড়ে ছিল। তাকে হাসপাতালে আনা হয়েছে।

দেবকুমারবাবু তৎক্ষণাৎ একটি ট্যাক্সি নিয়ে চলে আসেন বাড়িতে।

এসে লোটনের কাকা আর মাকে বলেন,—চলুন, খবর পাওয়া গেছে।

সুধন্য ঝিমোচ্ছিল। কামিনী কিন্তু রাত জেগে বসে ছিল, চোখ দুটো তার জবাফুলের মতো রাঙা হয়ে উঠেছে।

ট্যাক্সি করে ওরা হাসপাতালমুখো রওনা হয়।

কামিনী শুধোয়—আমার লোটনকে পাব তো বাবু?

দেবকুমারবাবু তাকান শুধু কামিনীর উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টির দিকে।

সুধন্য ধমকে ওঠে কামিনীকে,—বড় ব্যস্তবাগীশ!

দেবকুমারবাবু মর্মে মর্মে অনুভব করেন কামিনীর বেদনার পরিমাপ। বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তানের মায়া! আসবার সময় দেখেছেন দেবকুমারবাবু, কামিনীর আকুলতা, আর আজ দেখছেন সেই কামিনী। এই মায়ের রূপ!

সান্ত্বনা দেবার জন্যেই হয়তো বা বলেন দেবকুমারবাবু,—পাবে বই কি। কলকাতা শহরে যাবে আর কোথায়?

তা বই কি! প্রতিধ্বনি করে সুধন্য—বাগের চোখ হারালে মিলে যায় শহরে, আর এ তো আমাদের লোটনা!

মূর্খ কামিনী হয়তো বা সান্ত্বনা পায়। হয়তো বা তাই। শহর কলকাতায় বাঘের চোখও যখন মেলে, তখন লোটন মিলবেই! লোটনের লেখা পোস্ট-কার্ডখানা আঁচল থেকে বার করে দেখতে থাকে নির্নিমেষে। পড়তে জানে না, তবু আঁকাবাঁকা অক্ষরগুলো দেখেই বুকটা ঠাণ্ডা হয় একটু। তার লোটনের হাতের লেখা।

হাসপাতালে এসে আপিসঘরের দিকে যায় ওরা।

তখন ভোর চারটে।

আপিসে রেকর্ড খুঁজতে খুঁজতে এক নার্সের সঙ্গে আলাপ হয়;—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তো এ্যাটেণ্ড করতুম। কালোপানা রোগা ছেলেটা তো?

কামিনী অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে,—হ্যাঁ, নাকটা একটু বোঁচাপানা, খুব ইয়ে পানা চোখ দুটি—

হ্যাঁ—বলে নার্সটি—রাস্তায় আন্‌কন্‌সাস্ হয়ে নাকি পড়ে ছিল, ফিবারটা ম্যালিগ্‌ন্যান্ট্ টাইপ। নিজের নাম বলতে পারে নি ছেলেটা। বিকারের ঘোরে

চেঁচাচ্ছিল শুধু, মের না, ছেড়ে দাও, মায়ের কাছে যাব, বুড়োশিব আমায় ডাকছে। কারো নাম কিন্তু জানা যায় নি ওর ডিলিরিয়াম থেকে।

কামিনীর বুক বুঝি ভেঙে যায়, মায়ের কাছে যাব বলেচে লোটন!

দেবকুমারবাবু শুধোন,—থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইওর ইনফরমেশনস্! কোথায় আছে এখন? প্লীজ একটু যদি দেখিয়ে দেন।

মারা গেছে। ভেরী স্যাড। আপনারা লাস সনাক্ত করে নিয়ে যান। কোল্ডরুমে আছে। নার্সটি চলে যায় হাইহিল জুতো খটখট করতে করতে।

কিছুক্ষণ নিথর হয়ে যায় বুঝি ঘরের বাতাস। এতক্ষণে চোখ পড়ে সকলের সংজ্ঞাহীনা কামিনীর দিকে। কামিনীকে ওরা ধরাধরি করে ফার্স্ট এডের জন্যে নিয়ে যায় ওখানে। কামিনীর হাতের মুঠো থেকে পোস্টকার্ডখানা মাটিতে পড়ে যায় সকলের অলক্ষ্যে। তাতে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা—মা, ইহারা আমাকে আটকাইয়া রাখিয়াছে। আমি মরিয়া যাইব। লোটন।

পোস্টকার্ডখানা পড়ে থাকে ধুলোয়! সকলের জুতোর তলায় পিষে যেতে যেতে সকলের অলক্ষ্যে চলে যায় আবর্জনার ভেতর। ভোর হতে তখন আর দেরি নেই।